কথা অথর্ব্ব বেদে দেখা যায়। তন্মে আছে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বিশেষ মহা-বনে কিম্বা কোন বনময় প্রদেশে ইহা পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদে অংছে, ভারত-বর্ষের পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে সোম-লতা জন্মায়। পশ্চিম ভারতে সোমতীর্থ নামে একটি স্থানও প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু তথায় অনুসন্ধান করিয়া সোমলতা পাওয়া যায় নাই। ফলতঃ যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় সোমলতা জল এবং স্থল উভয় স্থানেই জন্মায়।

---

# জ্বরের কথা।

( শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস )

—:০:—

"জ্বর" কি? অনেকেরই ধারণা আছে যে, জ্বর একটা ব্যারাম। কিন্তু বাস্তবিক কথা জ্বর ব্যারাম নয়। জ্বর একটা লক্ষণ মাত্র। জ্বর তবে কিসের লক্ষণ? জ্বর দুইটী জিনিষের লক্ষণ—প্রথমতঃ, শরীরের মধ্যে কোনও বিজাতীয় বিষ প্রবেশের লক্ষণ। দৃষ্টান্ত যথা,—হাতে যদি কিছু ফুটিয়া গেল ও ও সে জায়গাটা পাকিল, ত অমনি জ্বর হইবে। পেটের মধ্যে আমাশয় বা গর-হজম বা অপর কোনও উপদ্রব উপস্থিত হইলেই জ্বর হয়। বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়া নিউমোনিয়া হইলেই জ্বর হয়। দ্বিতীয়তঃ—শরীরে প্রবিষ্ট বিষের প্রতিক্রিয়ার দরুণ যেমন জ্বর হয়, তেমনি মানসিক উদ্বেগ বা উত্তেজনার ফলেও জ্বর হইতে পারে। অত্যন্ত দুশ্চিন্তা, প্রবল ক্রোধ বা দুঃখ, ভয় প্রভৃতির ফলেও, জ্বর হইতে পারে।

আমাদের দেহ সুস্থ অবস্থায় সর্ব্বদাই একই উত্তাপ রক্ষা করিতেছে। অনেকের ধারণা যে, সে উত্তাপটি ৯৮'৪ ফারেন্‌হাইট্। দেশভেদে এই স্বাভাবিক উত্তাপের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা বিলাত অনেক উচ্চে অবস্থিত;—কাজেই বিলাতের উচ্চতা এবং তথাকার বায়ু চাপ বাঙ্গালাদেশের উচ্চতা ও বায়ু-চাপের সঙ্গে সমান নহে। এইজন্য বিলাতের লোকদের স্বাভাবিক দৈহিক উত্তাপ ৯৮'৪ হইলেও, এদেশের লোকদের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৬'৪ হইতে ৯৮° এই সংখ্যার মধ্যে। জ্বর হইলে, গা গরম হয়; অথচ, সুস্থদেহে, আমাদের সকলেরই দেহের উত্তাপ একটা নির্দ্দিষ্ট উত্তাপের বেশীও হয় না, কম ও হয় না—৯৬'৪ হইতে ৯৮° এর মধ্যেই থাকে। তবে জ্বরের সময়ে এ অতিরিক্ত উত্তাপ আসে কোথা হইতে? ইহার উত্তরে বলিব—এই নরদেহ আজব কারখানা। এখানে কত কি যে কাজ হয়, কত কি যে সৃষ্ট হয়, তাহা ভাবিলেও অজ্ঞান হইতে হয়। শরীর খুব

গরম বোধ হইলে, আমরা গা খুলিয়া দিই, এবং গায়ে অজস্র ঘাম হইতে থাকে—যেন দেহের সমস্ত জলের কলের মুখগুলিকে এক সঙ্গে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে! আবার শীত বোধ হইলে, আমরা খুব মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকি; অথবা যদি জামা না জোটে, তবে খুব হাত পা নাড়িয়া বা খানিকটা দৌড়িয়া দেহকে গরম করি—অর্থাৎ যেন মাংসপেশী গুলিকে খুব খাটাইয়া উত্তাপের সৃষ্টি করি। এই যে ঘাম দ্বারা দৈহিক উষ্ণতার হ্রাস ও মাংসপেশীকে খাটাইয়া উষ্ণতার সৃষ্টি—এ সবই এই দেহের কাজ। সমস্ত দেহের তাবৎ কাজই মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত হয়। আমাদের মস্তিষ্কে তিনটি জায়গা আছে—একটির কাজ, যে যে দৈহিক প্রক্রিয়ায় উত্তাপাধিক্যের সৃষ্টি হয়, তাহাদিগকে খাটান; অপরটির কাজ হইতেছে, সেই সমস্ত উত্তাপকে বাহির করিবার চেষ্টা; তৃতীয়টীর কাজ—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটান। এই দুইয়ের মধ্যে (উত্তাপ জমা ও খরচের মধ্যে) তৃতীয়াংশটি তাপ-সামঞ্জস্য ঘটাইতেছে। এই উত্তাপ-সামঞ্জস্যের ফলে, আমাদের দেহের উত্তাপ সদাসর্ব্বদাই একই থাকিয়া যাইতেছে। মস্তিষ্কস্থ এই উত্তাপ-সামঞ্জস্য-বিধায়িনী কেন্দ্রের গোলযোগ উপস্থিত হইলেই, জ্বর হয়।

জ্বরে কি কি বিপদ হইতে পারে—জনসাধারণের সেগুলি বেশ করিয়া জানা থাকা উচিত। জ্বর হইলেই শরীরে উত্তাপ বাড়ে। অধিক উত্তাপের ফলে, দেহের সুকুমার সকল জিনিসই ধ্বংস বা ধ্বংসপ্রায় বা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে;—কাজেই জ্বরের প্রথম কুফল—দেহ-ক্ষয় এবং দেহের সমস্ত যন্ত্রের বিকলতা প্রাপ্তি। জ্বর হইলেই মাথায়, যকৃতে (লিভারে), বুকে অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়। মাথায় রক্ত "চড়ার" ফল—এলোমেলো বকুনি (বিকার); বুকে রক্ত জমার ফল, নিউমোনিয়া ইত্যাদি; লিভারে রক্ত জমার ফল—লিভার বড় হইয়া যাওয়া। এইগুলি জ্বরের দ্বিতীয় কুফল। জ্বরের তৃতীয় কুফল—দেহের কোনও কোনও যন্ত্রের কার্য্য-ভার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়া; অথবা কিয়ৎকালের জন্য একরকম বন্ধ থাকা। জ্বরে শরীরের ক্ষয় হয়; সেই দ্রুত-ক্ষয়িত পদার্থগুলিকে দেহ হইতে বাহির করিতে যাইয়া, প্রস্রাবের যন্ত্র (Kidney) অনেক সময়ে বিকল হইয়া পড়ে। প্রস্রাবের যন্ত্র বিকল হইলে, প্রাণনাশের ভয় থাকে। জ্বরের চতুর্থ কুফল—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা। প্লেগ, নিউমোনিয়া প্রভৃতি জ্বরে, হৃৎপিণ্ড সহজেই ভীষণভাবে জর্জ্জরিত হইয়াই প্রাণ-নাশ ঘটায়। একশো পাঁচের উপরে তাপ উঠিয়া বেশীক্ষণ থাকিলে হৃৎপিণ্ডের পক্ষে এই ভয়টি খুব বেশী। কচিছেলেদের ও দুর্ব্বল লোকদের পক্ষে, পাঁচ ছয় ঘণ্টা স্থায়ী ১০৬° কি ১০৭° জ্বর প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে। আমি দীর্ঘস্থায়ী, প্রাণান্তক ১০৮ ডিগ্রি জ্বর পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। ম্যালেরিয়া, বাতজ্বর, প্লেগ প্রভৃতিতে অকস্মাৎ ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রিজ্বর হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

জ্বরের "অপকারিতা" বলিলাম। জ্বরের "উপকারিতা" কিছু আছে কি? আছে বৈ কি। জ্বরই প্রকৃতির প্রধান চেষ্টা—দেহের মধ্যে আগন্তুক জীবাণুগুলিকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য। অধিকাংশস্থলেই, দেহের মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করিয়াই জ্বরের উৎপত্তি ঘটায়।

উৎপত্তি ঘটায় অধিকাংশ জ্বরই জীবাণুজ। জ্বরের জালায় জীবাণুরাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের দেহ-নিঃসৃত বিষও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভগবানের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! দেহকে বিষ মুক্ত করিবার জন্তই জ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব জ্বর দেখিলেই, তাড়াতাড়ি, তাহাকে কমাইতে সকল সময়ে চেষ্টা করা উচিত নয়। কতকগুলি জ্বর আবার "মেয়াদী"—অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টকাল স্থায়ী। ম্যালেরিয়া জ্বর সাধারণতঃ ৮।১০ ঘণ্টার বেশী থাকে না; নিউমোনিয়া জ্বর সাধারণতঃ ৫ম, ৭ম, ৯ম, অথবা ১১শ দিবসে আপনিই মগ্ন হয়। টাইফয়েড জ্বর সাধারণতঃ ২১ দিনে ছাড়ে; ডেঙ্গু প্রভৃতি কতকগুলি জ্বর আছে তাহারা কেহ ৩য়, কেহ ৭ম, কেহ ১০ম দিনে ছাড়ে। চিকিৎসা কর আর না কর, ঐ সকল "মেয়াদী" জ্বর আপনার মেয়াদ লইবেই লইবে। জবরদস্তী করিয়া ছাড়াইতে যাইলে, অনিষ্ট হয়। এই জন্য, সুচিকিৎসকগণ সকল সময়ে ঔষধ দিবার জন্য ব্যস্ত হন না। তাঁহারা খালি নজর করিয়া যান—প্রকৃতি দেবী কোন পথে যাইতেছেন। জ্বর আপনিই আপনার কারণ ধ্বংস করে—এই মূলমন্ত্র ধরিয়াই বর্ত্তমান সুচিকিৎসকেরা যা-তা করিয়া বসেন না।

এক্ষণে জ্বরে গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি? জ্বর হইলেই প্রথম কর্ত্তব্য—গোড়া হইতেই রোগীকে শয্যা গ্রহণ করান। জ্বর-রোগী যত গোড়া হইতে শয্যার আশ্রয় লইবে, ততই তাহার জ্বর অল্পকাল স্থায়ী হইবে, অবশ্য মেয়াদী জ্বরের কথা স্বতন্ত্র। গোড়া হইতেই কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া, ভাবনা চিন্তাকে ত্যাগ করিয়া, বিছানায় শুইয়া থাকিলে, জ্বরের প্রকোপ ও স্থায়ীত্ব যেমন কম হইবার কথা, উপসর্গাদি তেমন না হইবার কথা। জ্বর গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইলে বা পরিশ্রম করিলে, জ্বর ছাড়িতে চায় না। (ক্ষয়কাস রোগীর জ্বর সম্বন্ধে এই কথাটী খাটে)।

জ্বরে গৃহস্থের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—গোড়ায় পথ্য লঙ্ঘন দেওয়া। আমরা পুরাতন জ্বরের কথা বলিতেছি না—তরুণ জ্বরের কথাই বলিতেছি। জ্বরে শরীরের ক্ষয় হয় বলিয়া, যদি রোগীকে ভোগসর্ব্বস্ব ইংরাজের মতে তাড়াতাড়ি "পুষ্টিকর" খাদ্য দিতে যাই, তবে কুফল হইবে। কারণ, প্রথমতঃ, জ্বরের প্রকৃতিই এই যে, রোগীর ক্ষুধা থাকে না; দ্বিতীয়তঃ, জ্বরে পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়, এমন কি পরিপাক যন্ত্রের এত বৈকল্য ঘটে যে, রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হয়, ক্ষুধা নষ্ট হয়, জিহ্বা ময়লায় ঢাকিয়া যায়, গা-বমি করে। সে রকম অবস্থায়, পাছে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এই অমূলক আশঙ্কায় তাহাকে কতকগুলা খাবার দেওয়া বড়ই ভুল। ডাক্তারেরা সে ভুল পদে পদে করেন। রোগীত দুর্ব্বল হইবেই—সে দৌর্ব্বল্য—জ্বরের বিষক্রিয়ায় ফল—শরীর ক্ষয়ের ফল নয়। এমন অবস্থায়, তুমি পুষ্টিকর খাদ্য দিলেও খাইবে কে, বা হজম করিবে কে? লাভের মধ্যে, গরহজম হইয়া বমি, দৌর্ব্বল্য ও জ্বর বাড়াইয়া দিবে। এ সম্বন্ধে আমাদের কবিরাজ মহাশয়দের পন্থা বড়ই সুখ্যাতির যোগ্য। জ্বরের অবস্থায়, রোগীরা আপনাআপনিই দুধ পান করিতে চাহেনা, অথচ ডাক্তারেরা চক্ষু বুজিয়া দুধ দিবার ব্যবস্থা করেন। একটু ভাবিয়া

দেখিলে, বাহির হইতে দেখিলে দুধকে যত সহজপাচ্য, তরল ও লঘু পথ্য মনে করা যায়, দুধ ত তাহা নয়,—দুধ যে ডেলা-ডেলা ছানার সমষ্টি! যদি কোন চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করা যায়—"জ্বর হইয়াছে, রোগী ছানা খাইবে কি?" তখনই তিনি শিহরিয়া উঠিয়া, তাহা নিষেধ করিবেন; কিন্তু দুধ পান করিতে বলিবার সময়ে, চিকিৎসকও ভাবেন না, যে, দুধ ছানার সমষ্টি। তরুণ এবং প্রবল জ্বরে দুধ বিষবৎ। আসল কথা এই যে, ডাক্তারেরা যে পাশ্চাত্য-গুরুর নিকট দুধ-পথ্যের গুণাগুণ শিক্ষা করেন, তাঁহারা প্রতি গ্রাসে মাংসপিণ্ড গলাধঃকরণ করেন এবং তিন বেলায় তাঁহাদের ভোজন পাত্রের কাছে ভাগাড়ের ক্ষুদ্র সংস্করণ জমায়েৎ হয়! কাজেই, সে জাতির পক্ষে, দুধ ও ভাত অতি লঘু পথ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষ এই খানেই। পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে, দেশী পথ্যাপথ্যকে আমরা অসার মনে করিয়া শ্লাঘা অনুভব করি। দেশী পথ্যাপথ্যের দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা না থাকায় লজ্জিত হই না এবং রন্ধন বিষয়ে মূর্খতা বশতঃ দেশী পথ্যকে উড়াইয়া দেওয়াই পরমার্থ জ্ঞান করি। ইংরাজী কেতাবে যে-যে পথ্যের কথা লেখা নাই, বা ইংরাজী কেতাবে যে-যে ভাবে পথ্যাপথ্য ইংরাজ তাহার নিজ দেশকালপাত্র হিসাবে বর্ণনা করিয়াছে, এ দেশীয় ডাক্তার মহাপ্রভুরা এদেশীয় হইলেও, সে-সে গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারেন না—অন্ততঃ, তাঁহাদের চিন্তা-শক্তি এত পঙ্গু হইয়া যায়, বা মানব-প্রাণটাকে তাঁহারা এত তুচ্ছ সামগ্রী মনে করেন যে, বিনা চিন্তাতেই সকল জ্বরেই "দুধ সাগুর" ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তরুণ ও প্রবল জ্বরে, দুধ না দেওয়াই উচিত। জল সাগু, জল বার্লি, টাট্‌কা আমানি, যব, চিঁড়া বা খৈ-মণ্ড, পাণিফলের বা শঠির পালো দৈএর ঘোল, জলের মিছরি ফুটান জল, ডাবের জল, গরমদুধে নেবুর রস দিয়া প্রস্তুত করা "ছানার জল' "চা" শুধু পানীয় শীতল বা গরম জল, সোডা-লেমনেড প্রভৃতিই প্রবল ও তরুণ জ্বরে উৎকৃষ্ট পথ্য। প্রবৃত্তি হইলে, বাসী বিলাতী "ফুড" গুলিকে খুব পাতলা করিয়া তৈয়ারি করিয়াও দেওয়া যায়। যে রোগীর জ্বর তরুণ ও প্রবল নয়, দুধ পান করিলে যাহার পেট হুড় হুড করে না, বা কাঁপে না, বা ভার বোধ হয় না, তাহাকে সাগু, বার্লি, এরোরুট বা শঠির বা পাণিফলের পালোর সঙ্গে মিশাইয়া দুধ পান করিতে দিতে পারা যায়। জ্বরে দুধ দিতে হইলে, কথনো খাঁটি দুধ দিতে নাই—জল অথবা সাগু, বার্লি, শঠি, এরোরুট—ইহাদের মধ্যে যেটা হউক একটা মিশাইয়া দিতে হয়। খাদ্য হিসাবে, সাগু, বার্লি, এরোরুট, পাণিফল বা শঠি প্রায় একই গুণাত্মক। জ্বর যেমন-যেমন বাড়িতে থাকে, দুধের পরিমাণ সেই অনুপাতে কমান উচিত—আবার জ্বর কম হইলে, দুধের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়ান যায়। ডালিম, বেদানা, আঙ্গুর জামরুল, গোলাপজাম, কমলালেবু, মিষ্ট বাতাবী লেবু, মিষ্ট আনারস, ইক্ষু, নাশপাতি, কিস্‌মিস্‌, খেজুর, মিছরি, বাতাসা এলাচদানা প্রভৃতিও অল্প বিস্তর দেওয়া যায়। প্রত্যেক ফলের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, উহার রস গ্রহণ করিয়া, "ছিবড়া" ফেলিয়া দিতে হইবে। টাইফয়েড্‌ জ্বর সন্দেহ হইলে বা উদরাময়

বা পেট ফাঁপা থাকিলে, আনারস, নাশপাতি, কিস্‌মিস্, খেজুর দেওয়া উচিত নয়।

জ্বরে তৃতীয় কর্ত্তব্য,—রোগীর স্বচ্ছন্দতা বিধান করা। রোগীর গায়ের উপর দিয়া সজোরে হাওয়া না বহে, তাহা করা উচিত; কিন্তু তাই বলিয়া, সমস্ত ঘরদ্বার বন্ধ করা কোন মতেই উচিত নয়। তোমার—আমার শয়ন ঘরের চেয়ে, রোগীর ঘরে বেশী ভাল বাতাস বহা উচিত। "ঠাণ্ডা লাগা"-জুজুর ভয়ে, রোগীর ঘরের "অন্ধি—সন্ধি" বন্ধ করিও না। রুদ্ধ—রুদ্ধ জানালা বা দরজা না খুলিলে, ঘরে হাওয়া খেলিতে পায় না। রোগীকে গলা পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়া, অবাধে ঘরে হাওয়া খেলিতে দিতে হয়। রোগীর ঘরে ছাড়ান ফল, খাওয়ার—এঁটো বাসন, অভুক্ত দুধ ইত্যাদি, বা মল, মূত্র, থুথু—গয়ার জমাইয়া রাখা অন্যায়। বরঞ্চ রোগীর ঘরে সুগন্ধি ফুল রাখা উচিত।

জ্বরে চতুর্থ কর্ত্তব্য—রোগীর মাথা ঠাণ্ডা রাখা। মাথায় জল, অডিকলোন মিশ্রিত জল, নিশাদল বা শির্কা মিশ্রিত জল বা বরফ দিয়া রোগীর মাথা ঠাণ্ডা রাখিবে। মাথা ঠাণ্ডা না রাখিলে, রোগী প্রলাপ বকে, বিনিদ্র হয়, ঝাঁকি মারিয়া উঠিতে চায় মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পায়। কচি ছেলেদের মাথায় রক্ত উঠিলে, তাহাদিগের "তড়কা" হয়। কাজেই জ্বরে মাথা ঠাণ্ডা রাখায় লাভ ষোল আনা, লোকসান মোটেই নাই। মাথায় জল বা বরফ দিলে, বুকে সর্দ্দি বসিবার কোনও আশঙ্কা নাই। এমন কি, নিউমোনিয়াতেও মাথায় নিরাপদে বরফ দেওয়া চলে। বিজ্বরে অথবা অল্প জ্বরে, মাথায় বরফ দিলে, রোগীর কোনও অনিষ্ট হয় না। কাজেই, যে কোনও জ্বরে (টেম্পাচারে), রোগীর মাথায় বরফ দেওয়া যায়। ১০৪ এর উপরে জ্বর উঠিলে, বরফ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সাধারণতঃ জ্বর ১০১ নামিলে বরফ তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। কখনো বরফ দিতে দিতে, তাহা মাঝে মাঝে উঠাইয়া লইতে নাই—তাহা করিলে, হঠাৎ খুব বেশী রক্ত মাথায় চড়ে—কাজেই, রোগী বেশী কষ্ট পায় বা প্রলাপ বকে। মাথা না কামাইয়া বরফ দিলে, তেমন কাজ হয় না—যত বেশী চুলের উপরে বরফ দেওয়া যায় ততই তাহা দেওয়া বৃথা হয়। মাথায় বরফ দিতে হইলে, থলি বা ব্যাগে করিয়া তাহা দেওয়াই ভাল—নতুবা বিছানা বালিশ ভিজিয়া যায় এবং বেশীক্ষণ ভিজা বালিশে শুইলে ঘাড়ে ব্যথা হইতে পারে। কচিছেলেদের মাথায় বরফের ব্যাগ বসাইতে হইলে, প্রথমে খানিকক্ষণের জন্য ২।৪ পাট কাপড়ের উপরেই তাহা বসান উচিত—নতুবা অত্যন্ত ঠাণ্ডায় মাথা জ্বালা করে। খানিকক্ষণ কাপড় বা তোয়ালের উপরে ব্যাগটিকে ধরিয়া, পরে তোয়ালে তুলিয়ে ফেলিতে হয়। কাপড়ের টুকরায় বরফ জড়াইয়া, তাহা মাথায় দিলে, মাথার চুল, বালিশ প্রভৃতি ভিজিয়া যায় এবং মাথার অতি সামান্য অংশেই বরফ লাগে। এই জন্য, মাথার "চাঁদির" উপরে একটা বড় ব্যাগ এবং ঘাড়ের পিছনে (যেখানে চুল শেষ হইয়াছে, সেখানে) ছোট একটি ব্যাগে করিয়া—এই দুই যায়গায়, একত্রে বরফ দেওয়া উচিত। শুধু জলের চেয়ে, নিশাদ, শির্কা বা স্পিরিট বা অডিকলোন মিশান

জল এবং তাহার চেয়ে বরফ জল, এবং সব চেয়ে শুধু বরফ বেশী মাথা ঠাণ্ডা করে। কপালে জলের পটি দিলে মন বুঝান হয় বটে কিন্তু কোনও বিশেষ উপকার করেনা। "জল পটি" দিতে হইলে, খুব পাতলা এবং একপুরু কাপড়ের টুক্‌রা দিতে হয়, এবং অনবরত তাহাকে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। জ্বর রোগীর মাথায় জল বা বরফ, পৌষমাসের মাঝরাত্রেও দিতে বাধা নাই।

জ্বরে পঞ্চম কর্ত্তব্য—যাহাতে ঘাম হয়, তাহা করা মল মূত্র ও ঘর্ম্ম, এই তিনটির সাহায্যে আমাদের দেহ হইতে অতিরিক্ত উত্তাপ বাহির হইয়া যায়। বারংবার, অতিমাত্রায় দাস্ত হইলে, রোগী কাবু হইয়া পড়ে;—কাজেই দাস্ত করাইয়া কেহ জ্বর কমাইতে খুঁজে না। ঔষধের দ্বারা অধিক প্রস্রাব করানও নিরাপদ কাজ নয়—বিশেষতঃ যে যন্ত্রটি প্রস্রাব সৃষ্টি করে—সেটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র বিধায়ে তাহাকেও পর্য্যুদস্ত বা জখম করা বোকামী। দেহের সে যন্ত্রটি জ্বরের জ্বালায় সহজেই জখম হইয়া আছে, এবং সে যন্ত্রটিরই উপরে শরীরের ক্ষয়িত পদার্থ নিষ্কাশনের প্রধান ভার, অতএব প্রস্রাবকারক ঔষধের দ্বারা "চাবুক মারিয়া" তাহার নিকট হইতে, তদবস্থায়, বেশী কাজ আদায় করার চেয়ে, রোগীকে প্রচুর পরিমাণে শীতল বা উষ্ণ জল, চা, ডাবের জল; বার্লি, মিছরির জল, সোডা, লেমনেড, ডালিম, বেদানা, প্রভৃতি খাওয়াইয়া প্রস্রাবকে বাড়াইয়া, শরীরের ক্ষয়িত পদার্থকে পাতলা করিয়া বাহির করানর চেষ্টাই সমীচীন। ম্যালেরিয়ায়, অথবা শীত করে এমন জ্বরে কম্পের সময়ে গরমজল পান করাইলে শীত ও কম্প কমিয়া যায়। রোগীর যদি শীত বা কম্প না থাকে, এবং গলার ব্যথা না থাকে, তবে যে রোগেই হউক না কেন, দিনে রাত্রে শীত গ্রীষ্মে, সকল সময়েই জ্বর-রোগীকে শীতল পানীয় দিতে পারা যায়। শীতকালে বা রাত্রে ঠাণ্ডা জল বা ডাবের জল পান করিলে, রোগীর শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয় বলিয়া যে ধারণাটী আছে, তাহার মূলে সত্য নাই। শীতল পানীয় পাইলে রোগীর তৃপ্তি হয় বলিয়া জ্বরে বারম্বার বরফ খাইতে নাই। দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে সামান্য বরফ দেওয়া জল এক-আধবার দেওয়া যায়, কিন্তু শীতল পানীয় অপেক্ষা গরম জল বা চা পান করিলে ঘর্ম্মও বাড়ে এবং তৃষ্ণাও কমে। জ্বর রোগীকে একেবারে অনেকটা জল দিতে নাই। জ্বরে গা-বমি করিলে, এক-পেট কুসুম কুসুম গরম জল বা সোডাওয়াটার খাইলে বিবমিষা দূর হয় এবং সমস্ত পেট ধুইয়া "ঝাড়িয়া" বমি হওয়ায় রোগী ও সুস্থ বোধ করে।

প্রস্রাব ও মল বাদ দিলে, ঘাম করান বাকী থাকে। ঘাম করাইলে রোগীর জ্বরও কমে, এবং সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। অথচ অধিকাংশ জ্বর রোগেই রোগীর ঘর্ম্ম প্রায় হয় না, গাত্র চর্ম্ম শুষ্ক ও রুক্ষ হয়। সাধারণের বোধ হয় জানা নাই যে, পৌষ মাসেও সুস্থ শরীরে সকলেরই ঘাম হয়—যদিও সে ঘাম আমরা দেখিতে পাই না। এইজন্য দৃশ্যতঃ ঘাম দেখা না যাইলেও, যে "অদৃশ্য ঘাম" হয়, তাহাকেও বাড়ান উচিত। গায়ের ঘামে বাতাস লাগিয়া সে ঘাম উপিয়া যাইলে, তবে শরীর ঠাণ্ডা হয়। অতএব ঘাম হইতে আরম্ভ হইলে, সেই ঘামকে উপিয়া যাইবার অবসর

দেওয়া চাই। ঘাম শুকাইতে যাইয়া যেন ঠাণ্ডা লাগান না হয়, সে দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

জ্বর রোগীর পক্ষে, এই নিয়মগুলি খাটাইয়া চলিলে রোগীর যথেষ্ট উপকার হয়। প্রথমতঃ রোগীকে বহু জামা কাপড় জড়াইয়া ঘর দ্বার খুব বন্ধ করিয়া না রাখিয়া, এমন ভাবে জামা কাপড় পরাইয়া রাখা উচিত, যাহাতে তাহার "গায়ের গরম" গায়ে লাগিয়া না থাকে, গা ঠাণ্ডা হইবার অবসর পায়—যাহাতে অদৃশ্য ঘাম সহজে উপিয়া যাইবার অবসর পায়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে, অনেকে জামার উপরে জামা জড়াইয়া রাখেন—ভুলিয়া যান যে, তাঁহারা রোগীর গায়ের উত্তাপ "তাড়াইতে" চান—গায়ের উত্তাপকে গায়ে "জড়াইয়া" রাখার ঠিক উল্টাই করিতে চান। অথচ কথায় ও কাজে এমন উল্টা ভাব ঘরে ঘরে দেখা যায়। রোগীর গাত্রদাহ উপস্থিত, সে বেচারী এতটুকু ঠাণ্ডা হাওয়া চায়—আর তাহার আত্মীয় স্বজনেরা ঘরদ্বার বন্ধ করিয়া, পাখার হাওয়াটুকু পর্য্যন্ত না দিয়া, রোগীকে ৪।৫দফা জামা কাপড়ে জড়াইয়া রাখেন—যাহাতে রোগীর গায়ের অদৃশ্য ও দৃশ্য ঘাম মৃদু মৃদু উপিয়া যাইতে পারে, সে ব্যবস্থা করাই উচিত। দ্বিতীয়তঃ আবশুক হইলে, শীতল জলের সাহায্যে রোগীর দেহের উত্তাপ কমান উচিত। যেখানে জ্বর ১০৫ হইতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, এমন অবস্থায় এবং ১০৬ বা তদূর্দ্ধে জ্বর উঠিলে "আইস-প্যাকিং" করা উচিত। ১০১ হইতে ১০৫ এর মধ্যে জ্বর থাকিলে, "স্পঞ্জ" করানই বিধেয়। এই দুইটি কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা পরে বলিতেছি। সাধারণের মধ্যে ধারণা আছে যে, স্পঞ্জ করান, শুধু জ্বর কমাইবারই জন্ত। কিন্তু জ্বর কমান ছাড়াও, উহার অপর একটি উদ্দেশ্য আছে; সেটি—রোগীর দেহে আরাম আনার জন্ত। "শরীর গরম," "মাথা গরম" বিনিদ্র অবস্থা, প্রভৃতি উপসর্গের শান্তি বিধান করাও স্পঞ্জ করার উদ্দেশ্য।

"আইস প্যাকিং"—একখানি ওয়েল ক্লথ পাতিয়া, তাহার উপরে রোগীকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া শোয়াইতে হইবে। ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া, ঘরে আলো জ্বালিয়া লইবে। মাথায় বরফের থলি বসাইয়া দিবে। আবশুক বইলে ( অর্থাৎ রোগী দুর্ব্বল হইলে ) পূর্ব্বেই কতকটা ব্রাণ্ডি সেবন করাইয়া লইবে। বরফ জলে একখানা প্রমাণ বিছানার চাদর নিংড়াইয়া গলা হইতে পা পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা রোগীকে জড়াইয়া দিবে—দেহের উঁচু-নীচু, খাঁজে খাঁজে চাদরখানিকে চাপিয়া বসাইয়া দিবে। ঐ চাদরের উপর একখানা মোটা কম্বল জড়াইয়া দিয়া, দশ পনর মিনিট অন্তর রোগীর জ্বর কত নামিল, তাহা পরীক্ষা করিবে। ১০২ কি ১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত জ্বর নামিলে, তাড়াতাড়ি ভিজা চাদর ও কম্বল খুলিয়া লইয়া, চার পাঁচজনে মিলিয়া শুকনা তোয়ালে দিয়া, বেশ করিয়া ধরিয়া সমস্ত গা মুছাইয়া শুকাইয়া দিবে। যদি তেমন জোরে হাওয়া না বহিতে থাকে, তবে আইস-প্যাকিং করিবার সময়ে আদৌ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না।

"স্পঞ্জ করা।"—এই জিনিষগুলি প্রথমেই হাতের কাছে আনিয়া রাখিবে।—থার্ম্মো-

মিটার, ২।৩ খানা শুক্‌না তোয়ালে, গামছা বা নেকড়া; ২।৩ খানা, ভিজা গামছা; এক প্রস্থ জামা কাপড়; লেপ-কাঁথা; এক ঘটি গরম জল ও এক ঘটি ঠাণ্ডা জল; টয়লেট ভিনিগার; একটা আলো; বরফ পূর্ণ থলি; ব্রাণ্ডি ১ মাত্রা। সমস্ত যোগাড় হইয়া গেলে সেদিন বাহিরে হাওয়ায় জোর থাকুক আর না থাকুক ঘরের জানালা দরজা সমস্ত বন্ধ করিয়া দিবে ও বাতি জ্বালিবে। রোগীর মাথায় বরফের থলি বসাইয়া দিবে এবং এক-মাত্রা ব্রাণ্ডিও খাওয়াইয়া দিবে। শীঘ্র শীঘ্র তাহার সমস্ত জামা কাপড় ছাড়াইয়া লইয়া একজন একটা হাত, অপর জন অপর হাত কেহ একটা পা, অপর আর একজন অপর পা—এই রকমে রোগীরসর্ব্বাঙ্গ ভাগ করিয়া লইয়া, অল্প গরম জলে গামছা নিংড়াইয়া ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বারম্বার ঘষিবে—যতক্ষণ না সেগুলি কতক পরিমাণে ঠাণ্ডা হইয়া আসে। বুক, পিঠ, পাঁজর ও পেট অতি অল্প সময়ের জন্য ঘষা উচিত—রোগীর গায়ের উত্তাপ যদি ১০৪ হয় তবে প্রথমে ১০২ ডিগ্রী উত্তাপের জলে গামছা ভিজাইয়া গা মুছিতে আরম্ভ করিতে হয় এবং বার বার ঐ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা করা জলে গামছা-টিকে এমন ভাবে নিংড়াইতে হয়, যেন তাহা হইতে টস্‌টস্ করিয়া জল পড়ে না, অথচ রোগীর গা কিছু কিছু ভিজিয়া যায়। এই ভাবে ৫।৭।১০ মিনিট গা মোছার পরে, রোগীর জ্বর কত কমিল, তাহা দেখা উচিত। জ্বর ২।৩।৪ ডিগ্রী কমিয়াছে বুঝিলে, সকলে মিলিয়া শুক্‌না তোয়ালে দিয়া তাড়াতাড়ি বেশ করিয়া ঘসিয়া গা শুকাইয়া, গরম করিয়া নিবে; এবং তৎক্ষণাৎ গলা পর্য্যন্ত র‍্যাপার প্রভৃতি দ্বারা ঢাকিয়া ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দিবে।

জ্বর হইলেই সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া রোগীর গায়ে জামা জোড়ার বাহুল্য করা ভুল—বরং তাহার উল্টা করিয়াই সুফল পাওয়া যায়। যথাক্রমে যেমন শুধু জল, অডিকলোন মিশ্রিত জল, বরফ জল ও বরফ—শীতল হইতে শীতলতর; তেমনি জ্বর রোগীকে অল্প হাওয়া খাইতে দেওয়া (অবশ্য আবশ্যমত জামা জোড়া পরাইয়া——বেশী বেশী পরাইয়া নয়), স্পঞ্জ করা, ও আইস প্যাকিং করা, সামান্য হইতে গুরুতর শীতলতা আনয়নের উপায়। এই সহজ কথা গুলি স্মরণ যোগ্য।

জ্বরে ষষ্ঠ কর্ত্তব্য—রোগীর দেহ পরিষ্কার রাখিবে। রীতিমত ধোয়ান, চুল আঁচড়ান নখ কাটা, চুল দাড়ি কাটা বা কামান, দাঁত মাজা, হাত-পা পরিষ্কার রাখা চাই। নাপিত-সাবান দিয়া হাত ধোয়াইয়া, কামাইতে প্রত্যবায় নাই। প্রত্যহ বিছানা শেষ ও কাপড়-চোপড় বদলান উচিত। আমাদের দেশে একটা প্রথা আছে যে, ব্যারামে ধোপার বাড়ী কাপড় দিতে নাই ও ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে নাই। নাপিত ও ধোপা নানা রকম লোকের বাড়ী নিত্য যাতায়াত করে বলিয়া, ছোঁয়াচে কোনও রোগ হইলে, ঐ নিয়ম পালন করা উচিত। কিন্তু যদি নিজের রোগটি ছোঁয়াচে না হয়, যদি নাপিত বেশ পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরিয়া থাকে, যদি নিজ নিজ ক্ষুর, কাঁচি, সাবান, বুরুষ, নরূণ প্রভৃতি ব্যবহার করা যায় এবং যদি নাপিতকে বেশ করিয়া সাবান দিয়া হাত

ধোয়াইয়া লওয়া হয়,তবে ক্ষৌর কর্ম্মে কোনও ন্যায্য বাধা থাকিতে পারে না। ঐ রকমে ছোঁয়াচে ব্যারাম না হইলে, ধোপার বাড়ী কাপড় দিতেও বাধা নাই। এই সংক্রান্ত দুইটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; প্রথমটি এই যে, একটি রোগী হইতে অপর বাড়ীতে ব্যারাম সংক্রামিত যাহাতে না হয়, তাহা সকলেরই কর্ত্তব্য। এবং দ্বিতীয় কথাটি এই যে,—সুস্থ শরীরে, অনেক সময় ছোঁয়াচে ব্যারাম ঘটিলেও রোগ ধরে না বটে, কিন্তু "অর-গায়ে" যে কোনও অপর ব্যারাম সহজেই আক্রমণ করিতে পারে। এই দুইটি মূল কথা মনে রাখিয়া বাহিরের জন সাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হয়।

স্বাস্থ্য, আষাঢ়,১৩৩০

---

# হাঁপানির কতিপয় মুষ্টিযোগ।

( শ্রীসুরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় )

আজকাল অধিকাংশ লোকে হাঁপকাশ রোগে জর্জ্জরীত দেখিয়া কতকগুলি মুষ্টিযোগ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। যদি ইহা কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দয়া করিয়া ইহার ফলাফল আমাকে জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন। আমি যতদুর জানি, এবং অন্যে যাহা জানেন তাহা জানাইতে সততই প্রস্তুত আছি। আমার নিকট পত্র আসিলে উত্তর দিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হ'বে না। তাঁহারাও আমার প্রতি এ অনুগ্রহ রাখিবেন।

১। পুষ্করিণীতে যে কাঁকড়া জন্মায় তাহাকে তেলো কাঁকড়া বলে। ঐ কাঁকড়া ৫টা থেঁতো করিয়া যে রস নির্গত হইবে, ন্যাকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং উহার সহিত গোলাপ জল কিছু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিবে, উপরিউক্ত নিয়মে তিন দিন সেবন করিবে, যদ্যপি অসুখের কিছু ছিট্ থাকে, তাহা হইলে ২।১ দিবস ঐ ঔষধ সেবন করিতে হইবে। ঔষধ সেবন কালীন শাক, অম্বল, কলাইয়ের ডাইল খাওয়া নিষেধ। ইহাক পরীক্ষিত।

২। খাঁটি গব্য ঘৃত ⁄।০ একপোয়া লইবে এবং ৫টা কালধুতুরার ফল বিচি ফেলিয়া দিয়া ঐ খোসা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া লইবে, পরে ঘুঁটের জালে ঘৃত চড়াইবে ঘৃতের গাঁজলা মরিয়া আসিলে উহাতে ঐ খোসাগুলি উত্তমরূপে ভাজিয়া ঘৃত জাল হইতে নামাইবে। ঐ ঘৃত প্রত্যহ একবার প্রাতে সেবন করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা হইতে ॥০ অৰ্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত সেবন কালীন শাক অম্বল,কলাইয়ের ডাইল খাওয়ানিষেধ।

৩। কালকাসুন্দে ( কাসমর্দ্দ ) ইহার বীজের চূর্ণ অর্দ্ধ আনা ওজন মধুসহ মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া খাইলে শ্বাস কাসে উপকার হয়।

৪। বেলপাতার, রস বাসক পাতার রস, শ্বেত ডানকুনী পাতার রস মোট ২ তোলা খাঁটি সরিষা তৈলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস রোগ ধ্বংস হয়। এক কুঁচ ডানকুনির শিকড়—পানের ভিতর ক'রে খাইলে হাঁপানি সারিয়া যায়।

৫। শুঁঠ, আকুল কাঁটান'টের মূল ও বামুন হাটী—সমপরিমাণ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ৴৵০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে জাল হইতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করিলে শ্বাস দূরীভূত হয়।

৬। একটী সম্পূর্ণ কুশের শিকড় দুই ভাগ করিয়া ১ ভাগ খাঁটি সরিষা তৈলে প্রস্তর পাত্রে ঘসিয়া প্রত্যহ দুইবার বক্ষঃস্থলে মালিশ করিবে, এবং অপর অর্দ্ধাংশ জলে বাটিয়া তরল পদার্থটা প্রাতে ও সায়াহ্নে পান করিবে এই-রূপ নিয়মে দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে। হাঁপ কাশ আরোগ্য হইবে। কুশের মূল গলায় ধারণ করিলে ও পীড়া আরোগ্য হয়। শাক, অম্বল, কলাইয়ের ডাইল খাওয়া নিষেধ।

৭। পুরাতন ইক্ষুগুড় খাঁটি সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শ্বাস বৃদ্ধির সময় চাটিয়া খাইলে হাঁপের উপশম হয়।

৮। তুলসী গাছে গুটি পোকা হয়, ঐ গুটিপোকা সংগ্রহ করিয়া তামার মাদুলিতে ঐ গুটিপোকা পুরিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে হাঁপানি নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। শাক, অম্বল, কলায়ের ডাইল খাওয়া নিষেধ।

৯। আরসোলা (তেলাপোকা) ৮।১০টা লইয়া একসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া এক-পোয়া জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ জল সমস্ত দিন রাত্রে অল্প অল্প সেবন করিবে। উপরিউক্ত নিয়মে প্রত্যহ প্রস্তুত করিয়া লইবে। এইরূপে সপ্তাহ কাল সেবন করিলে হাঁপানি আরোগ্য হয়।

১০। লাল লবণ ।৵০ আনা, আদার রস ॥৵০ আনা, মধু ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিলে শ্বাস রোগ আরোগ্য হয়।

১১। কালধুতরার পাতা শুষ্ক করিবে, পরে গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া মিহি সোরার গুঁড়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশিতে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিবে। হাঁপ বৃদ্ধি হইলে একটি পাত্রে ঐ গুঁড়া রাখিয়া অগ্নি-সংযোগ করিবে। যখন উহা হইতে ধূম নির্গত হইবে তখন নাক ও মুখ দ্বারা ঐ ধূমের শ্বাস টানিয়া লইবে, তৎক্ষণাৎ হাঁপ নিবারণ হইবে।

১২। যে কোন কলার মোচা লইয়া থেবড়াইয়া (থেঁতো) ক'রিয়া রস বাহির করিবে, ইহার রস ১ তোলা, আকন্দর আঠা ২ ফোঁটা, বাসক পত্রের রস ১ তোলা, এই কয়টি দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া হাঁপানি রোগীকে খাইতে দিলে ২০।২৫ মিনিট মধ্যে নিশ্চয় হাঁপানি বন্ধ হইবে। ইহা পরীক্ষিত।

# বঙ্গে লোক সংখ্যা, জন্ম ও মৃত্যু ।

( ১৯২১ সালে আদমস্থুমারী অনুসারে ) .

| জিলার নাম | লোকসংখ্যা | |
|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রীলোক |
| বর্দ্ধমান | ৭৩২৩৬৯ | ৭০৬৫৫৭ |
| বীরভূম | ৪২২৯৮৬ | ৪২৪৫৮৪ |
| বাঁকুড়া | ৫০৯'৩৪ | ৫১০৬০৭ |
| মেদিনীপুর | ১৫৩৯৬৫২ | ১৩২৭০০৮ |
| হুগলী | ৫৬১২৬৮ | ৫১৮৮৭৪ |
| হাবড়া | ৫৩৫১৫১ | ৪৬২২৫২ |
| ২৪ পরগণা | ১৪৩০৭৫৮ | ১১৯৭৪৮৭ |
| কলিকাতা | ৬১৭৫৯০ | ২৯০২৬১ |
| নদীয়া | ৭৬১৩৪৫ | ৭২৬২২৭ |
| মুর্শিদাবাদ | ৬২৮৭৪২ | ৬৩৩৭৭২ |
| যশোহর | ৮৯৩৫৯৩ | ৮২৮৬২৭ |
| খুলনা | ৭৫৭৫২৪ | ৬৯৫৫১০ |
| রাজসাহী | ৭৬৭৩৭০ | ৭২২৩০৫ |
| দিনাজপুর | ৮৯৬৪০০ | ৮০৮৯৫৩ |
| জলপাইগুড়ি | ৫০৬৩৯৭ | ৪৩২৮৭২ |
| দার্জ্জিলিঙ্গ | ১৪৯০৯৪ | ১৩৩৬৫৪ |
| রঙ্গপুর | ১৩১৬৮৪০ | ১১৯১০১৪ |
| বগুড়া | ৫৩৮৭২৭ | ৫০৯৮৭৯ |
| পাবনা | ৭০৬৭০২ | ৬৮২৭৯২ |
| মালদহ | ৪৯২৮২২ | ৪৯২৮৪৩ |
| ঢাকা | ১৫৭২২২০ | ১৫৫৩৭৪৭ |
| ময়মনসিংহ | ২৫১০৪৫০ | ২৩২৭২৮০ |
| ফরিদপুর | ১১৪৭৭৪২ | ১১০২১১৬ |
| বাখরগঞ্জ | ১৩৪৩১৬৩ | ১২৮০৫৯৩ |
| চট্টগ্রাম | ৭৭৭৮৮২ | ৮৩৩৫৪০ |
| নোয়াখালী | ৭৩৮৭২২ | ৭৩৪০৬২ |
| ত্রিপুরা | ১৪০৬১৩৪ | ১৩৩৬৯৩৯ |
| সমগ্রবঙ্গ | ২৪০৫৭৯৩৬ | ২২৪৬৪৩৫৭ |

| জিলার নাম | জন্ম | |
|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রীলোক |
| বর্দ্ধমান | ২০৪৭৫ | ১৮৯৬৫ |
| বীরভূম | ১৪৬০৮ | ১৩৭৩৪ |
| বাঁকুড়া | ১৬৮০৫ | ১৫৫২৯ |
| মেদিনীপুর | ৩৪২৭৪ | ৩৪৫৮১ |
| হুগলী | ১৪৩৯৩ | ১৩১৫০ |
| হাবড়া | ১৩৯৫৯ | ১২৫৫৯ |
| ২ পরগণা | ২৮০০৫ | ২৫৩৮২ |
| কলিকাতা | ৯৩২৬ | ৭৯৮২ |
| নদীয়া | ২৪০৩৬ | ২২৪৯৫ |
| মুর্শিদাবাদ | ২৫৬০৫ | ২৩৯৪২ |
| যশোহর | ২২৭৪৬ | ২৬৫৯০ |
| খুলনা | ২২৪৮১ | ২০৮৪৬ |
| রাজসাহী | ২৫৩৭৪ | ২৪০৪৩ |
| দিনাজপুর | ৩২৯৯৮ | ৩১১২২ |
| জলপাইগুড়ি | ১৫৫৪০ | ১৪৫৭৫ |
| দার্জ্জিলিঙ্গ | ৪২১৩ | ৪১৫৫ |
| রঙ্গপুর | ৩৯৬৫২ | ৩৮০৯০ |
| বগুড়া | ১২৫৪৮ | ১১৪৪০ |
| পাবনা | ১৭৪৭৮ | ১৬৫৪৯ |
| মালদহ | ১৮১৬৩ | ১৬৭৩২ |
| ঢাকা | ৪১৪৫০ | ৩৮৪৫৪ |
| ময়মনসিংহ | ৬ ৮৬১ | ৬৩৭২৫ |
| ফরিদপুর | ৬১০৫ | ২৩০৭৭ |
| বাখরগঞ্জ | ৪২২৮২ | ৩৮৪৫৯ |
| চট্টগ্রাম | ২৬৩৮৯ | ২৩৯৪২ |
| নোয়াখালী | ২২৬৭৬ | ২০৫০৮ |
| ত্রিপুরা | ৩২৫৪৯ | ২৯৬৮৫ |
| সমগ্রবঙ্গ | ৬৭৪৭৯১ | ৬২৬২১০ |

| জিলার নাম | হিন্দুর মৃত্যুসংখ্যা | | জিলার নাম | মুসলমানের মৃত্যুসংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রীলোক | | পুরুষ | স্ত্রীলোক |
| বর্দ্ধমান | ২১০৫৯ | ১৯৪৫১ | বৰ্দ্ধমান | ৫১৭২ | ৪৯৫৬ |
| বীরভূর | ১১৯১৩ | ১০৭৩০ | বীরভূম | ৩৭৪০ | ৩৪৪৩ |
| বাঁকুড়া | ১৭৫৬৪ | ১৬৫৩৯ | বাঁকুড়া | ৯০২ | ৮৬৬ |
| মেদিনীপুর | ৩৭০৫৩ | ৩৬১৭৯ | মেদিনীপুর | ২৬৫৯ | ২৪৬৪ |
| হুগলী | ১৪৩৮৯ | ১৫৪৬৩ | হুগলী | ২৮৯৯ | ২৭৯১ |
| হাবড়া | ১২১৪৫ | ১০৬৬৮ | হাবড়া | ৩০৪৬ | ১৮১৪ |
| ২৪ পরগণা | ২৩৭৩০ | ১৯৯৫৪ | ২৪ পরগণা | ১৪৯২৭ | ১৩১৮১ |
| কলিকাতা | ১২৬৬০ | ৯০৮৪ | কলিকাতা | ৪২৯০ | ৩১৯১ |
| নদীয়া | ১২৪৫১ | ১১৩৪১ | নদীয়া | ১৯৭৪৪ | ১৮২৪৬ |
| মুর্শিদাবাদ | ১১৭১৩ | ১০৫৩৩ | মুর্শিদাবাদ | ১৩৮৪৮ | ১২৪৯৮ |
| যশোহর | ১১৯২৩ | ১১৬৯৪ | যশোহর | ২১৫৬৩ | ১৯১৮২ |
| খুলনা | ৯০৫৩ | ৮০৮৫ | খুলনা | ১০৬৫৯ | ৯৬২২ |
| রাজসাহী | ৫৪৩৮ | ৫০০৩ | রাজসাহী | ২৬২৮৭ | ২৫০৩১ |
| দিনাজপুর | ১৩৫৯৩ | ১১৯৯৫ | দিনাজপুর | ১৫৯৯৯ | ১৪৮৪২ |
| জলপাইগুড়ি | ৭০৪৮ | ৫৯২৫ | জলপাইগুড়ি | ৪৩৫৫ | ৪০৭৮ |
| দার্জ্জিলিঙ্গ | ৪৮৪২ | ৪৩৬২ | দার্জ্জিলিঙ্গ | ২২৪৯ | ১৯৫ |
| রঙ্গপুর | ১১২৯৩ | ১০৪২৭ | রঙ্গপুর | ২৩৩৪৬ | ২১৮৮১ |
| বগুড়া | ২৬২৭ | ২৫৭১ | বগুড়া | ১৫০১৮ | ১৩৫৭১ |
| পাবনা | ৫২৬৪ | ৪৮৫১ | পাবনা | ১৭৫৮৯ | ১৫০১৩ |
| মালদহ | ৬৮৯৫ | ৫৪০০ | মালদহ | ৭৫৪০ | ৬৬০৪ |
| ঢাকা | ১৬৩৩৩ | ১৫৩৪৯ | ঢাকা | ২৯৭৭৪ | ২৬৯৯৫ |
| ময়মনসিংহ | ১৭৬২৫ | ১৬০৬৪ | ময়মনসিংহ | ৪৭৭৯৯ | ৪৩৭০৮ |
| ফরিদপুর | ১৭৮০০ | ১৫৯৫৮ | ফরিদপুর | ২৩৫৬৪ | ২২৩৪৭ |
| বাখরগঞ্জ | ৯৯৬৮ | ৮৪৫৭ | বাখরগঞ্জ | ২৮৭৬৩ | ২৫১৬১ |
| চট্টগ্রাম | ৪১৯১ | ৪২২৯ | চট্টগ্রাম | ১৪৭১৬ | ১৪০৮০ |
| নোয়াখালী | ৩৭৪৮ | ৩৫৬৪ | নোয়াখালী | ১৪২২৪ | ১৩৫২০ |
| ত্রিপুরা | ৭৩৬৬ | ৬৭৭৮ | ত্রিপুরা | ১০৮৭৯ | ১৫৪১৪ |
| সমগ্রবঙ্গ | ৩২৩৪৯৪ | ২৯৩৪৫৪ | সমগ্রবঙ্গ | ৩৯০৫৩১ | ৩৫৪৩৯৪ |

| জিলার নাম | মৃত্যু পুরুষ | স্ত্রীলোক |
|---|---|---|
| বর্দ্ধমান | ২৭৪২০ | ২৫২১২ |
| বীরভূম | ১৭১৫৫ | ১৫৩৯৩ |
| বাঁকুড়া | ২০১০৬ | ১৮৯২৯ |
| মেদিনীপুর | ৪২০১০ | ৪০৪৪৯ |
| হুগলী | ১৮১১৬ | ১৬৮৮৩ |
| হাওড়া | ১৫২০৬ | ১৩৪৮৯ |
| ২৪ পরগণা | ৩৯০৫২ | ৩৩১৬০ |
| কলিকাতা | ১৭৫৮৮ | ১২৮০২ |
| নদীয়া | ৩২৩৯৭ | ২৯৭১২ |
| মুর্শিদাবাদ | ২৫৯৭৪ | ২৩৪০৪ |
| যশোহর | ৩৩৫১৯ | ৩০৮৯০ |
| খুলনা | ১৯৭৪৬ | ১৭৭২৯ |
| রাজসাহী | ৩২৫৫৯ | ৩০৬৮১ |
| দিনাজপুর | ৩২২৫৮ | ২৯০৪২ |
| জলপাইগুড়ি | ১৫১৭৩ | ১৩৬৪৮ |
| দার্জ্জিলিঙ্গ | ৬৩১১ | ৫৮৪১ |
| রঙ্গপুর | ৩৪৯১০ | ৩২৫৩৭ |
| বগুড়া | ১৭৯৭৩ | ১৬২১৭ |
| পাবনা | ২২৮৫৯ | ১৯৮৬৯ |
| মালদহ | ১৫৫৮৪ | ১৩০৮৬ |
| ঢাকা | ৪৬২৭৭ | ৪২৪৮২ |
| ময়মনসিংহ | ৬৬২১৩ | ৬০৩৭৫ |
| ফরিদপুর | ৩৫৪২২ | ৩৩৩৫৩ |
| বাখরগঞ্জ | ৩৮৮২৯ | ৩৩৭১৪ |
| চট্টগ্রাম | ১৯৬৫৬ | ১৮৯৯৪ |
| নোয়াখালী | ১৭৯৮৮ | ১৭০৯৩ |
| ত্রিপুরা | ২৫২৫৪ | ২২২০৩ |
| সমগ্রবঙ্গ | ৭৩৫৬৩৮ | ৬৬৭৩৯২ |

# স্বর্ণবঙ্গ।

( শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ )

—:০:—

স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত করিতে কি কি উপাদানের প্রয়োজন তাহা কবিরাজ মাত্রেরই জানা থাকিলেও সর্ব্বসাধারণের এ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকা অস্বাভাবিক নহে! কবিরাজেরা স্থান বিশেষে কেহ কেহ কৃত্রিমতা করিয়া ঔষধ নষ্ট তো করেনই, অধিকন্তু সাধারণের নিকট বিশ্বাস হীন হইয়াও পড়েন,আয়ুর্ব্বেদের মর্য্যাদা এইরূপ ভাবেই অনেকে নষ্ট করিয়া বসেন। ইহা আয়ুর্ব্বেদের দোষ নহে, ব্যবসায়ীর চাতুরী মাত্র। প্রবঞ্চক কবিরাজ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদেরই যে কেবল মর্য্যাদা নষ্ট হয় এমন নহে, সর্ব্বসাধারণে ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাননা অথবা ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিপরীত ফল প্রাপ্ত হন। হাতুড়িয়াগণ এবম্বিধ কার্য্য করিতে যত সাহস না পান, শিক্ষিত বঞ্চক কবিরাজেরা এ বিষয়ে সাহসী ও সিদ্ধহস্ত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ ও রোগীর সর্ব্বনাশ করেন।

স্বর্ণবঙ্গ নাম বলিয়া সাধারণে মনে করিতে পারেন, ইহাতে অবশ্যই স্বর্ণের পরিমাণ বেশীই পড়ে অথবা স্বর্ণ ও বঙ্গ সমপরিমাণে পড়ে বলিয়াই স্বর্ণ বঙ্গ নাম রাখা হইয়াছে। আর এই স্বর্ণবঙ্গের চেহারা দেখিলে কে ইহাকে খাঁটী কাঁচা সোণা না কহিবে? ইহার রং এত উজ্জ্বল ও হরিদ্রাভ যে, ইহাকে দেখিলেই খাটী স্বর্ণচূর্ণ বলিয়াই ধারণা হইবে। অথচ ইহাতে বিন্দু বা পরমাণু মাত্রও স্বর্ণ পড়ে না। ইহার উপকারিতা যথেষ্ট থাকিলেও ইহা একটী সাধারণ ঔষধ—ইহা সুলভ মূল্যের ঔষধ। প্রমেহাধিকারে অবস্থা বিশেষে ইহার আশ্চর্য্য-রূপ রোগারোগ্যকারী ক্ষমতা দেখা যায়।

একদা আমি পীড়িত হইলে কোন এক উচ্চ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষিত কবিরাজকে তত্ত্ব দিই, তিনি আসিয়া স্বর্ণবঙ্গের ব্যবস্থা করেন ও সঙ্গে যে স্বর্ণবঙ্গ আনিয়াছিলেন তাহা দেখাইলেন। দেখিয়া মনে করিলাম, না জানি কত স্বর্ণ দিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। সে কবিরাজ যে রাজবাটীতে যাতায়াত করেন তাঁহার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতেইআমাকে দেখাইতে আনিয়াছেন, আরও বলিলেন "বহুমূল্য ঔষধ বলিয়া সর্ব্বদা ইহা প্রস্তুত থাকে না। আমার কাছে একটী পুরাতন উৎকৃষ্ট মোহর বা ৩২৲ টাকা আপাততঃ দাবি করিলেন। মদীয় পিতৃব্য তৎক্ষণাৎ ৩২৲ টাকা দেওয়ার আদেশ করিলেন কিন্তু আমার কনিষ্ট ভ্রাতা নানা আপত্তি করিয়া পরদিন দেওয়ার কথা বলিয়া দিল। ঘটনা বশতঃ সেই সময়ই একজন বিজ্ঞ কবিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত করিতে কত স্বর্ণের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন "স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত করিতে স্বর্ণের মোটেই দরকার নাই। আমরা বলিলাম—"অমুক কবিরাজ ইহা প্রস্তুত করিতে এক মোহর স্বর্ণ দাবি করিয়াছেন।" তিনি শুনিয়া লজ্জায় জিহ্বা কাটিলেন ও কহিলেন—"হায় এত বড় কবিরাজের এই কর্ম্ম! এই সকল কবিরাজেরাই আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বনাশ করিতেছেন।" তখন তিনি তাঁহার গৃহ হইতে মুদ্রিত ভৈষজ্যতত্ত্ব আনাইয়া স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুতে কি কি জিনিস দরকার তাহা দেখাইয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মাইলেন যে, স্বর্ণবঙ্গে মোটেই সোণার দরকার নাই। সে দিন তাঁহার পুস্তক স্থানা রাখিয়া দিলাম। পরদিন ঐ কবিরাজ মহাশয় প্রাতেই তাঁহার একজন ছাত্র পাঠাইয়া টাকা চাহিলেন। আমরা বলিয়া দিলাম—"কবিরাজ মহাশয়কে আসিতে বলিবেন, আরও প্রয়োজন আছে।" টাকার লোভে কবিরাজ মহাশয় তাড়াতাড়ি আসিলেন, আমরা কহিলাম—স্বর্ণবঙ্গে ত স্বর্ণ পড়ে না, এই দেখুন আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকে কি লিখা আছে?" তিনি নানা কথায় আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, আমরা বুঝিলাম না বা টাকা দিলাম না। ইহার পর হইতে (প্রায় ত্রিশবৎসর) উক্ত কবিরাজের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি, আমাদের পরিচিত মত কেহ তাঁহার নিকট ঔষধার্থে যায় না। বিজ্ঞ কবিরাজ বলিয়া তাঁহার নিকট ব্যবস্থা লইয়া থাকে। তিনি যে প্রকার বিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ, তিনি যদি সৎপথে থাকিতেন তবে তিনি বহুলাভবান হইতেন। এখন তাঁহার এই ব্যবহারে তিনি ক্ষতিগ্রস্থই হইয়াছেন। ব্যবসায়ের ভিত্তি কৃত্রিমতার উপর স্থাপিত হইলে ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়, ঔষধ কাটে না, কেবল এই সকল প্রবঞ্চক কবিরাজ কখনই আয়ুর্ব্বেদের ক্ষতি করিতে বা তাহার মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারিবেনা কিন্তু তাঁহাদের নিজেদেরই সর্ব্বনাশ করিবেন, এই সকল ব্যাপারে কবিরাজদের দুর্ণাম হইয়া থাকে। আমার বিবেচনায় আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী মাত্রেই এইরূপ কৃত্রিম ব্যবসায়ীকে শাসন ও একঘ'রে করিলে আয়ুর্ব্বেদ ও আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীর মর্য্যাদা রক্ষা হইবে। উপযুক্ত ও শাস্ত্রোক্ত বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে ঔষধ ফলোপদায়ক হয় না, সুতরাং ঔষধে ফল না পাইয়া লোকে আয়ুর্ব্বেদেরই নিন্দা করিয়া থাকে।

# বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

:০:

## দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তির জন্য স্বাদের তারতম্য।

কোন জিনিসের আস্বাদন গ্রহণ করা সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি আসলে তাহা অতি জটিল ব্যাপার। কেবলমাত্র আস্বাদনের শক্তির দ্বারা আমরা চারি প্রকার রস বুঝিতে পারি, যথা—মিষ্ট, অম্ল, তিক্ত ও লবণ। ইহা ছাড়া অন্যান্য সূক্ষ্ম রকমের স্বাদ সকল আমরা ঘ্রাণশক্তির জন্যই সেই সকল স্বাদের ব্যতিক্রম বুঝিতে পারি। কোন রকম মিষ্ট চাটনি অথবা জ্যাম খাইবার সময় আমরা নাসিকা বন্ধ করিয়া রাখিলে বুঝিতে পারি যে, চাটনির আসল স্বাদ আমরা পাইতেছি না। এই রকম অবস্থায় ফলের স্বাদেরও কোন বিশেষত্ব আমরা বুঝিতে পারি না।

কিন্তু আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, কোন জিনিসের ভাল করিয়া স্বাদ পাইতে হইলে দৃষ্টি শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। অনেক লোক আছেন যাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পান করিলে চা কি কফি খাইতেছেন—বলিতে পারেন না। ধূমপায়িগণ অন্ধকারে বসিয়া ধূমপান করিয়া সুখ পান না। যে সকল ধূমপায়ী গত যুদ্ধে অন্ধ হইয়াছে তাহারা বলে যে, ধূমপান করিয়া আর তাহারা তামাকের আস্বাদন পায় না। তামাকের ধূম দেখার সহিত ধূমপায়ীর তামাকের আস্বাদনের সম্পর্ক আছে। এই সকল দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তির জন্য স্বাদের তারতম্য হইয়া থাকে।

## মর্দ্দনের ফলে রোগ আরাম।

যাঁহারা কসরত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একটা কথা আছে যে, ব্যায়াম করিয়া যত না শক্তি বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্টি হয়, তাহার দ্বিগুণ হয় শরীর মর্দ্দন করিয়া। ইহাও সকলে জানেন যে, শরীরের নানাস্থানের রোগ অনেক সময় কেবল মর্দ্দন করিয়া উপশম ও আরাম হয়। সম্প্রতি চিকিৎসকগণ শরীরের নানাস্থানে মর্দ্দন বা চাপ প্রদান করিয়া রোগ আরাম করিতেছেন। এই অদ্ভুত উপায় যদিও আশ্চর্য্যজনক* তথাপি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাতে স্থায়ী উপকার হইতেছে এবং সেইজন্য এইরূপ চিকিৎসা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে।

গোঁড়া চিকিৎসকগণ এই উপায় অবলম্বন করিতে রাজী নহেন। অনেকেই এই চিকিৎসাকে উপহাস করিয়া থাকেন কিন্তু

* এই প্রবন্ধের লেখক মহাশয় মর্দ্দনের ফলে রোগ আরোগ্য হয় জানিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন কেন বুঝিলাম না। তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলি ভাল করিয়া পড়িলে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই বুঝিবেন। আয়ুর্ব্বেদে তৈলাদি মর্দ্দনের চিকিৎসা যথেষ্ট আছে। "ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দনাৎ নতু ভক্ষণাৎ" ইহা আয়ুর্ব্বেদে বহুকাল পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। আঃ সং।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,—অনেক রোগীর এই চিকিৎসায় অতি আশ্চর্য্যজনক উপকার হইয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পুরাতন রকম চিকিৎসার দ্বারা কোন কোন রোগের যখন উপকার হয় নাই তখন এই উপায়ে সেই সকল রোগ দূর হইয়াছে।

এই চিকিৎসা প্রথমে ডাক্তার ফিজ-গেরাল্ড আরম্ভ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই চিকিৎসায় মানুষের শরীরস্থ বিদ্যুতের জন্য এই উপকার হয়। কি প্রকারে এই উপকার হইয়া থাকে তাহা ঠিক নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিতে পারেন না। তবু তিনি ইহা বুঝিতে পারেন যে এই, বিদ্যুৎ শরীরের মধ্য দিয়া কোন প্রকারে যায়, কারণ প্রত্যহই তিনি ঐ বিদ্যুতের সাহায্যে চিকিৎসা করিতেছেন, তবে ইহা স্নায়ুর কার্য্য নহে। যদিও তর্ক হিসাবে ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, ইহা স্নায়ুর দ্বারা সংঘটিত হয় কিন্তু তাহা ধরিয়া লইলে ইহা কোন্ স্নায়ুর দ্বারা হয় তাহা মানুষের এখনও অজানিত। এখনও বুঝা যায় নাই কেন শরীরের এক অংশ শরীরের অপর প্রান্তের কার্য্য সকলের উপর কর্তৃত্ব করে। শরীরে কতকগুলি কেন্দ্র আছে, সেই সকল কেন্দ্রে চাপ দিলে বা মর্দ্দন করিলে অপর স্থানের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

দেখা গিয়াছে যে, শরীরের কোন কোন স্থানে চাপ দিলে, ঘসিলে, মর্দ্দন করিলে কিম্বা মৃদু আঘাত করিলে শরীরের অপর স্থানে কোন কোন রূপ নির্দ্দিষ্ট ও স্থির নিশ্চয় ফল দেখিতে পাওয়া যায় বা অস্বস্থি ঘটে। কি জন্য এরূপ ঘটে তাহা জানা কৌতুহলপ্রদ বটে কিন্তু তাহাপেক্ষাও কৌতুহলপ্রদ কোথায় এবং কিরূপভাবে চাপ দিতে হইবে বা ঘসিতে হইবে তাহা জানা থাকা। একদিন উক্ত চিকিৎসকের কাছে একজন বালিকাকে আনা হইয়াছিল। তাহার দক্ষিণ বাহু বেঁকিয়া পৃষ্ঠের দিকে চলিয়া গিয়াছিল এবং সেই বালিকা তাহার হাত খুলিতে পারিত না। তাহার পার্শ্বদেশে মেরুদণ্ডের দিকে মৃদু আঘাত করিবার ফলে তাহার শক্ত হাত ক্রমে নরম হইয়া আসিল এবং ক্রমে সে যথেচ্ছামত হাত নাড়িতে আরম্ভ করিল। এই চিকিৎসায় যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয় তাহার নিজের গৃহেও করা সম্ভব।

দুই হাতের আট আঙ্গুল একসঙ্গে ঘসিলে কেশ দীর্ঘ হয়, কিন্তু টাক সারে না। যে স্থান হইতে চুল একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, তৎস্থানে নূতন চুল উঠান অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এমন কি কখন নূতন কেশ আর হয় না।

এই নূতন উপায়ে যে রোগ আরামই হইয়া থাকে কেবল তাহাই নহে, ইহা দ্বারা রোগাক্রমণ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়। ফুসফুসের যক্ষ্মারোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এই চিকিৎসার বিধি অনুসারে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পেট সঙ্কুচন করিতে হইবে। এই অবস্থায় ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্র উপরে উঠিয়া পড়ে ও পাকস্থলীস্থ ভুক্তাবশিষ্ট চাপের জন্য নিম্নগামী হয়; ইহাতে সমগ্র শরীরের রক্ত চলাচল ভাল করিয়া হয়। এই অবস্থায় থাকিলে ফুসফুসের উপর অংশ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে রোগী বাধ্য হয়। এই উপরিভাগেই যক্ষ্মারোগ প্রায়ই আরম্ভ, কারণ ফুসফুসের এই অংশ অধিক ব্যবহৃত

হয় না। আমাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই পাকস্থলী ও ফুসফুসের মধ্যে যে পর্দ্দা আছে, তাহার সাহায্যেই শ্বাসপ্রশ্বাস চালাই এবং তাহার ফলে আমাদিগের ফুসফুস বেশী ব্যবহৃত হয় না ও তজ্জন্য উহাতে রোগ সৃষ্টি হওয়ার সুবিধা হইয়া পড়িয়া থাকে। যে ব্যক্তি ফুসফুসের সমস্ত অংশ দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করে, তাহার যক্ষ্মারোগের আক্রমণ হইবেই না একথা প্রায় নিশ্চিত করিয়া বলা যায়, কারণ সেই ব্যক্তি যখনই ঐ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় তখনই উক্ত রোগ কর্ত্তৃক ভাল করিয়া আক্রমিত হইবার পূর্ব্বেই ঐ রোগের বীজ বাহির করিয়া দেয়। ইহা শুধু চিকিৎসা নহে, ইহা দ্বারা রোগাক্রমণের বাধা প্রদান করা হয়।

পায়ের শিরা ফুলিয়া উঠা ও দড়ীর মত পাকাইয়া যাওয়ার এক রোগ আছে, উহাকে vericose veins বলে, কোমরের পেশী সঙ্কুচন করিলে ঐ রোগ হয় না এবং হইলেও ঐ রোগও পদ প্রভৃতির নানারূপ রোগ দূর হয়।

সঞ্জীবনী।

# সমালোচনা।

রোগ বিজ্ঞান। -বৈদ্যাচার্য্য কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় এম·বি ( Gold meidalist Homœopath) কাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য এক টাকা। ৮৫ নং বিডন ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। এই পুস্তকের কিয়দংশ "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটির বক্তব্য বিষয় রোগোৎপত্তির মূলীভূত কারণে জীবাণুতত্ত্ব। অধুনা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান—জীবাণুই রোগের কারণ নির্ণয় করিলেও প্রাচীন যুগের ঋষিবৃন্দই যে ইহার প্রথম আবিষ্কারক—গ্রন্থকার তাহা স প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফলও হইয়াছে। এই পুস্তক হইতে অনেক গবেষণা মূলক তথ্য জানিতে পারা যাইবে। চিকিৎসক সমাজে ইহা সমাদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

সরল কবিরাজী চিকিৎসা। কবিরাজ শ্রীগিরিজা ভূষণ রায় প্রণীত। মূল্য ১৲টাকা ২০৩।২ মনোমোহন লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। খুব সোজা কথায় এবং বাঙ্গালায় সকল রোগের নিদান ও চিকিৎসা পদ্ধতি এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। পুস্তক খানির প্রণয়নে গ্রন্থকার খাটিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থগণও ইহা ঘরে রাখিলে উপকার পাইবেন।

মর্ম্মবাণী।— শ্রীকালাচাঁদ দালাল প্রণীত শান্তিপুর -প্রেম নিকেতন হইতে শ্রীচিদানন্দ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এ খানি কবিতাপুস্তক, কিন্তু মলয় বাতাস, চাঁদের কিরণ, ফুটন্ত জোছনা লইয়া লিখিত নহে, সবগুলিই ধর্ম্মমূলক, পড়িলে প্রাণে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা হয়। সোজা কথায়, সরল ভাবে প্রাণের উচ্ছ্বাস ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই কবিতা প্লাবিত বঙ্গে অন্য কবিতা ফেলিয়া এরূপ কবিতাই তো প্রিয় জনের হাতে তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু সে কর্ত্তব্য পালনে পাঠকেরাও অবুঝ, লেখকদিগের তো কথাই নাই। ঘুরান কথার অর্থ চাপিয়া ভাবের অনুক্তি বা অব্যক্তি, রাখিতে না পারিলে আজকালকার দিনে কবিতাই হইবেনা—ইহাই হইয়াছে বর্ত্তমান বাঙ্গালা কবিতার প্রকৃতি। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে কালাচাঁদ বাবু যে সে রীতি অবলম্বন করেন নাই, ইহা দেখিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি। কাব্যামোদী বাঙ্গালীকে আমরা এ গ্রন্থ পাঠ করিতে পরামর্শ প্রদান করিতে পারি।

# বিবিধ প্রসঙ্গ।

কবিরাজ রাজেন্দ্র নাথ।—কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরাজ রাজেন্দ্র নাথ সেন শাস্ত্রী মহাশয় আর ইহলোকে নাই। হার্ট ফেল করিয়া সংপ্রতি তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে। কবিরাজ রাজেন্দ্র নাথ প্রাতঃস্মরণীয় গঙ্গাধরের শেষ ছাত্র ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে, কলিকাতায় গঙ্গাধরের শিষ্য বলিতে কেহই আর রহিলনা। ইহার অভাবে খাঁটী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বমাজের চূড়া খসিয়া পড়িল বলা যাইতেও পারে। আমরা কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথকে হারাইয়া বিশেষ মর্ম্মব্যথা পাইয়াছি। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি সেচন করুন।

পণ্ডিত উমেশচন্দ্র।—পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নও আর ইহ জগতেনাই। বৈদ্যবংশের অসাধারণ প্রতিভাশালী—সমগ্র বেদের পরম পণ্ডিত উমেশচন্দ্রও অমরধামে গমন করিয়াছেন। ইঁহার মত বাগ্মী এযুগে খুব কমই দেখা যাইত। ইঁহার প্রণীত "মানবের আদি জন্মভূমি" জাতিতত্ব বারিধি প্রভৃতি পুস্তকে ইঁহার চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল সাধন করুন।

বাঙ্গালার পল্লী।—বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে কিরূপ লোকক্ষয় হইতেছে, তাহা ১৯২১ সালের সরকারি রিপোর্ট পড়িলেই অনুমিত হইতে পারে। উহাতে প্রকাশ, এই সালে বঙ্গের পল্লীগ্রাম সমূহে

| | |
|---|---|
| কলেরায় মরিয়াছে | ৭৩,৯৪৩ জন। |
| বসন্তে ,, | ৭,৮০৫ জন। |
| কালাজ্বরে ,, | ৯,২৬ জন। |
| ম্যালেরিয়ায় ,, | ৭,৩৭,৩,২৩ জন। |
| সর্ব্ববিধজ্বরে ,, | ১০,৪৬,৩,৬১ জন। |
| আমাশয় ,, | ১৩,৭,৪৮ জন। |
| ইনফ্লুয়েঞ্জাজ্বরে ,, | ২,৮,০৯ জন। |
| নিউমোনিয়ায় ,, | ৫,৭,৬১ জন। |
| যক্ষায় ,, | ১,৩,৯৫ জন। |

সমগ্র পল্লী সমূহে ১৯২১ সালে মোট অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৪ কোটী ৩৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৭ শত ৮৭ জন। এই হিসাবে বাঙ্গালার পল্লীগুলির লোকক্ষয় কিরূপ হইতেছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ফলে বাঙ্গালার পল্লীগুলীর অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে অচিরে ধ্বংস সাধন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের নূতন সেসন আরম্ভ হইতেছে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ এবং সিংহল ও ব্রহ্মদেশ হইতেও বহুসংখ্যক ছাত্র আসিয়া ভর্ত্তি হইতেছে। এখানো ছাত্র গ্রহণ করা হইতেছে, কিন্তু যেরূপ অবস্থা তাহাতে গতবর্ষের ন্যায় এবারও বোধ হয় অনেককে ভর্ত্তি হইতে আসিয়া বিফল মনোরথ হইতে হইবে। গত বৎসর ৬০ জনকে ভর্ত্তি করার পর ১৩ জনকে স্থান দিতে পারা যায় নাই, এবারও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, যাঁহারা ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা যেন আর একদিনও দেরী না করেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতাল।—ভারতের নানা স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হইতেছে দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইয়াছি। আমাদের পাঠকগণ জানেন, ভারতের বিভিন্ন স্থানের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি আয়ুর্ব্বেদের প্রচার কামনায় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে বৃত্তি বা স্কলারসিপ দিয়া ছাত্রগণকে পড়াইয়া থাকেন। অনেক স্থানের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটি সেই সকল স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ও খুলিয়াছেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকেই তাঁহারা চিকিৎসালয়ের ভার দিয়া থাকেন। ভারতের প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডও মিউনিসিপ্যালেটীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে যেদিন আমরা একার্য্যে অগ্রসর দেখিব, সেইদিন বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত ঋষিযুগ ভারতে ফিরিয়া আসিল।

কবিরাজ, শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট্, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ্ রোড্ হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

# আয়ুর্ব্বেদ

৭ম বর্ষ } শ্রাবণ ১৩৩০ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

## ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

[ কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ ]

বৎসরের মধ্যে এমন এক একটী সময় আইসে, যখন কোন একটী বিশিষ্ট রোগ সমাজে ব্যাপকভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়া অধিকাংশ নর নারীকে পীড়া দান করে। আমাদের আলোচ্য ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নামক রোগটীও এই ধর্ম্মাবলম্বী। ইহা সাধারণতঃ ঠাণ্ডার সময় প্রাদুর্ভূত হয়। বিশিষ্ট কালে ইহাদের উৎপত্তি এবং কালস্বভাবেই ইহারা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'কালকৃত ব্যাধি' বলা হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ এই সকল রোগের কারণ সম্বন্ধে বলেন যে, বিশিষ্ট বিশিষ্ট বীজাণু এই সকল রোগের হেতু।

তাহারা শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে যদি শরীরের ভিতর যে রোগ প্রতিরোধক শক্তি ( Immunity ) বিদ্যমান আছে তাহা যদি রোগ বীজাণুর শক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বল হয় অর্থাৎ শরীর যদি এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে যে অবস্থায় তজ্জাতীয় বীজাণু শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে তাহারা রোগ প্রতিরোধক শক্তিকে পরাভূত করিয়া নিজেদের বংশ বিস্তার সাধন করিতে পারে — তাহা হইলে তাহারা রোগোৎপাদনে সমর্থ হয়। আমাদের কিন্তু এ মতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার এখনও যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই এই সকল রোগ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট কালে উৎপন্ন হয়, অন্য সময় হয় না।

ইহা দ্বারা আমরা এই বুঝি যে, প্রাকৃতিক অবস্থাবিপর্য্যয়ে এমন এক একটী সময় আইসে যখন কোন একজাতীয় রোগ উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে আমরা এই বুঝিতে পারি

যে, দুষ্ট কালই ব্যাধি উৎপাদন করিতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই কালের দুষ্টি কি প্রকারে হয়? অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যা যোগযুক্ত শীতোষ্ণবর্ষ লক্ষণ কালের দুষ্টির প্রতি হেতু কাল নিরপেক্ষ হইয়া কোন পদার্থই থাকিতে পারে না। সুতরাং সেই দুষ্ট কাল সংস্পর্শে আসিয়া সকল পদার্থই দুষ্ট হয়, এবং সেই সকল দুষ্ট পদার্থের অন্যায় পান ভোজনাদি জন্য মনুষ্যের শরীরও দুষ্ট হয়। তখন শরীরে তৎকাল কৃত বিশিষ্ট রোগ উৎপন্ন হয়। অগ্নিবেশ মহর্ষি পুনর্ব্বসু আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"মানব দিগের প্রকৃতি, আহার, দেহ, বল সাত্ম্য ও বয়স ভিন্ন ভিন্ন হইলেও—একই ব্যাধি যুগপৎ জনপদে উৎপন্ন হইয়া বহুনর নারীর পীড়া দানে কি প্রকারে সমর্থ হয়?" তদুত্তরে ভগবান পুনর্ব্বসু আত্রেয় বলিতেছেন, "মনুষ্যের প্রকৃত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদিগের কতকগুলি ভাবের তুল্যতা আছে। এই সকল ভাবের তুল্যতা হেতু তুল্যকালে তুল্য লক্ষণযুক্ত ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়। বায়ু, জল, দেশ ও কাল এই গুলি সকলের পক্ষেই সমতুল্য। কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিলে প্রথমতঃ কাল দুষ্ট হয়, দুষ্টকাল সংস্পর্শে বায়ু, জল ভূমি ও ওষধি সকল বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। তখন সেই বিকৃত বায়ু, সলিল এবং ওষধির অন্যায় স্পর্শ ও পান ভোজন হেতু শরীরও দোষ দ্বারা দুষ্ট হইলে, এই প্রকার কোন বিশিষ্ট রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।" বীজাণু রোগের কারণ হইলে কাল নিরপেক্ষ হইয়া রোগোৎপাদন করিতে পারিত, কিন্তু তাহা যখন পারে না, তখন কি করিয়া বীজাণুকে রোগ-কারণ বলা যাইতে পারে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—জীবন ধারণের অনুকূল অবস্থা না পাইলে জীবাণুগণ বাঁচিতে পারে না। কালাদি দ্বারা শরীরের যখন রোগ প্রতিরোধক শক্তি নষ্ট হয়, সেই সময় বীজাণু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বংশ বিস্তার পূর্ব্বক রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। আমরা কিন্তু ইহা অতিস্থূল দর্শীর কথা বলিয়া মনে করি। কারণ আমরা দেখিতে পাই, এমন একএকটী সময় আইসে—যখন বাহ্য জগতে মশক, মক্ষিকা, পিপীলিকা বল্মীক কিম্বা ছারপোকা প্রভৃতি বিশিষ্ট এক জাতীয় কীটের আবির্ভাব হয়। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে যে জাতীয় জীবের বংশ বৃদ্ধির অনুকূল ব্যবস্থা জন্মে, সেই জাতীয় জীব সেই সময় বংশ বিস্তার করিয়া থাকে। বাহ্য জগতে যেমন এই ব্যাপার সংঘটিত হয়, আভ্যন্তর জগতেও সেই প্রকায় কালাদি দ্বারা শরীরে দোষ প্রকুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিয়া থাকে। তখন যে জাতীয় জীবের (তথা কথিত রোগ-বীজাণু) বংশ বিস্তারের অনুরূপ হয়, তজ্জাতীয় জীব শরীরে প্রবেশ করিয়া বংশ বিস্তার করে মাত্র। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে কাল দুষ্ট হইলে বায়ু, জল, ভূমি ও ওষধি দুষ্ট হয়। তখন সেই সকলের অন্যায় স্পর্শে ও পান ভোজন জন্য দেহে দোষ প্রকুপিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে। ইহাই সকল প্রকার রোগের নিদান।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের আয়ুর্ব্বেদীয় নাম লইয়া অনেক মতভেদ বিদ্যমান আছে।

কিন্তু তাহাতেও কিছু আসে যায় না। কারণ রোগের নাম না জানা থাকিলেও স্বরূপ বুঝিতে পারিলে চিকিৎসা আট্‌কাইবে না। "বিকার নামা কুশলো ন জিহ্রীয়াৎ কদাচন। নহি সর্ব্ব বিকারাণাং নামতো হস্তি ধ্রুবা স্থিতি ॥

রোগের স্বরূপ বুঝিয়া দোষের বলাবল নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে পারিলেই সাধ্য রোগ আরাম করিতে পারা যায়। এই জন্য ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে লক্ষণাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা যে সকল ক্ষেত্রেই তুল্য লক্ষণ বিশিষ্ট, এমত নহে। অনেক সময় ইহা বিভিন্ন রোগ বলিয়াই মনে হয়। আমরা যখন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার বিবরণ বর্ণন করিতেছি, তখন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলিতে যাহা সাধারণতঃ বুঝায় তাহাই বলিব।

১। সাধারণতঃ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে বিশেষ কোন উপসর্গ থাকেনা, মাত্র সামান্য জ্বর, সর্দ্দি, মস্তকে ও গাত্রে বেদনা এবং সামান্য কাসি বিদ্যমান থাকে। এরূপ অবস্থায় লঘু পথ্যের সহিত ২বেলা ২টী মহালক্ষ্মী-বিলাস-আদার রস ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিলেই সারিয়া যায়।

২। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ শীত হইয়া জ্বর হয়, রোগীর নাসারন্ধ্রে অত্যধিক শুষ্কতা অনুভূত হয়, সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি ও শুষ্ক কাসি থাকে, গলা বেদনা, চোখ জ্বালা ও চোখ দিয়া অনবরত জল পড়া ইত্যাদি আনুসঙ্গিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এখানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বায়ু শ্লেষ্মাকে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া স্রোতো-নিরোধ জন্য শুষ্কতা অনুভূত হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে আম পাচনার্থ ও স্রোত-বিশোধনার্থ পঞ্চকোল পাচন প্রয়োজ্য।

শ্লেষ্মাকে তরল করিয়া উঠাইয়া দিবার জন্য এবং গলা-বেদনাদির উপশম জন্য মহালক্ষ্মী বিলাস—আদার রস ও সৈন্ধব সহযোগে প্রয়োজ্য। জ্বরের বেগাধিক্য না থাকিলে, জ্বরঘ্ন ঔষধ দিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বেগাধিক্যে তুলসী পাতার রস মধু সহযোগে মৃত্যুঞ্জয় রস দেওয়া যায়। যদিও নবজ্বরের প্রথমাবস্থায় দুগ্ধ নিষিদ্ধ, তথাপি এ ক্ষেত্রে দুগ্ধ প্রয়োগ করিলে শ্লেষ্মাকে বাড়াইয়া নাসারন্ধ্রের ও কাসির শুষ্কতা নষ্ট করিয়া দেয়। নিম্ন লিখিত ভাবে দুগ্ধ প্রয়োগ করিতে হয়।

দুগ্ধ— ⁄। এক পোয়া

পিপুল
যষ্টিমধু } প্রতিদ্রব্য ॥৹ তোলা
তেজপত্র

তালমিশ্রি—২ তোলা

জল— ⁄॥৹ আধসের

দুগ্ধ শেষে ছাঁকিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় প্রয়োজ্য। এতদ্ভিন্ন খইএর মণ্ড, মুগের যূষ ও মিশ্রি দেওয়া যায়।

রোগীর মুখে তালমিশ্রি রাখিয়া চুষিতে দেওয়া ভাল।

কাসির বেগের জন্য খুব কষ্ট বোধ করিতে থাকিলে, তালীশাদি চূর্ণ বা তাল মিশ্রির সহিত 'চন্দ্রামৃত রস' চুষিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ শুষ্ক কাসির শান্তির নিমিত্ত গরম জলের সহিত 'কাস ভৈরব' ব্যবস্থেয়। প্রথম হইতে এই অবস্থা

উপেক্ষা করিলে Pneumonia হইবার আশঙ্কা থাকে।

৩। সর্ব্বাঙ্গ বেদনা, অসহ্য শিরঃপীড়া, অত্যধিক দুর্ব্বলতা এবং তৎসহ জর দেখা যায়। অনেক সময় এই অবস্থায় রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে। কখন কখন জর বেশী না থাকিলেও প্রলাপ দেখা যায়। শিশুদের এই প্রকার ইনফ্লুয়েঞ্জা হইলে তড়্কা হইতে দেখা যায় এবং অনেক সময় Meningitis পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে,ইহাতে বায়ুর প্রকোপেরই আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জন্য ইহাতে জর বেগের ও নাড়ীর বৈষম্য বিদ্যমান থাকে। এরূপ অবস্থায় মাথার যন্ত্রণার শান্তির নিমিত্ত কুড়্—চন্দনের ন্যায় ঘষিয়া কপালে প্রলেপ দিতে হয়। মাথার যন্ত্রণার শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা নিরন্তর প্রয়োজ্য। আভ্যন্তরিণ প্রয়োগের নিমিত্ত দশমূল পাচন এবং নিম্ন লিখিত যোগটী প্রয়োজ্য।

( বহু পরীক্ষিত )

| | |
|---|---|
| মকরধ্বজ | ১রতি |
| মহালক্ষ্মীবিলাস | ১ বটী |
| মৃত্যুঞ্জয় রস | ১ বটী |
| কর্পূর | ১ রতি। |

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩ মাত্রা করিয়া দিবসে ৩ বার পানের রস ও মধুসহ প্রয়োজ্য।

শিরঃ এবং গাত্র বেদনার আধিক্য থাকিলে কিম্বা Meningitis এর আশঙ্কা থাকিলে পঞ্চরক্ত্ রস আদার রস ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে ব্যবস্থেয়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ১টী বেদানার রস ও মধু সহ প্রয়োজ্য।

এই রোগে খইএর মণ্ড, মুগের যূষ পথ্য। দুগ্ধ এ ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নহে। রোগীর দৌর্ব্বল্য নাশের নিমিত্ত বরং মাংসরস ( Broth ) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঠাণ্ডা হইতেই এ রোগের উদ্ভব। কোনও প্রকারের ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি পাচকাগ্নি ব্যাহত হয়, তাহা হইলে জরের সহিত অগ্নিমান্দ্যের নানা-প্রকার উপসর্গ দেখা যায়। যেমন গা বমি বমি করা, অনেক সময় পাত্লা দাস্ত, প্রবাহিকা ( আম আসা ) উদরাধ্মান এবং তজ্জনিত শরীরের উপর বিষক্রিয়া ( Toxemia ) ইত্যাদি। এরূপ অবস্থা উপেক্ষিত হইলে রোগীর শ্বাসের গতি দ্রুত হয় এবং নাড়ী লোপ পাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়।

এরূপ অবস্থায় বিবমিষা থাকিলে রোগীকে বৃহদ্বাতচিন্তামণি—বড়এলাচ চূর্ণ ২ রতি, কর্পূর ½ রতি ও মৌরী ভিজান জল সহ দিতে হয়। মলভেদ শান্তির নিমিত্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর—কর্পূর ½ রতি চালুনী জল সহ প্রয়োগ করিতে হয়। উদরাধ্মান শান্তির জন্য মকরধ্বজ ½ রতি, যবক্ষার ৴৹ এলাচ চূর্ণ ২ রতি ও কর্পূর ½ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া মৌরীর জল সহ প্রয়োজ্য। এরূপ অবস্থায় যাহাতে রোগীর প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য জলীয় পথ্য অধিক মাত্রায় দিতে হয় মৌরী ও মিশ্রি ভিজান জল, লেবুর রস মিশ্রিত বালি'র জল এবং ছানার জল ইত্যাদি।

নাড়ী লোপ পাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ—বেদানার রস সহ এবং অগ্নিতুণ্ডী কর্পূর ½ রতি পানের রস ও মধু সহ দিতে হইবে। উদরে অসহ্য বেদনা থাকিলে তার্পিন ও সর্ষপতৈল একত্র করিয়া পেটে মালিস এবং ভুবনেশ্বর—মরিচ চূর্ণ ২ রতি চালুনি জল সহ কাঁটানটের শিকড় ছেঁচিয়া যে রস পাওয়া যায় সেই রসের সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিজে বিশেষ মারাত্মক না হইলেও অচিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে; সম্যক্ চিকিৎসা না করিলে ইহা হইতে Pneumonia, pluresy, Heart daisease, Kidney disease ও নানাপ্রকার শিরোরোগ হইতে পারে। এই কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জা চিকিৎসায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। নড়াচড়া করিতে কিম্বা উঠা বসা করিতে দেওয়া উচিত নহে। রোগী যেরূপ তাপ বা শৈত্যের আকাঙ্ক্ষা করে, তদুপযোগী তাপ বা শৈত্য প্রয়োগ করা উচিত। মাথার যন্ত্রণা অত্যধিক হইলে বরফ দেওয়া যাইতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে যদি তজ্জন্য রোগী অশান্তি বোধ করে, তবে আরগ্বধাদি পাচন ভিন্ন অন্য কোন বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। তীক্ষ্ণ বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনেক সময় হিতের পরিবর্ত্তে অহিত সাধিত হইয়া থাকে। রোগীর ঘরে আলোক ও বায়ু যাহাতে সম্যক্ চলাচল করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত, কিন্তু রোগী যদি তাহাতে অশান্তি বোধ করে, তবে ঘর বন্ধ করিয়া রাখাই ভাল। রোগ সারিয়া গেলেও রোগীর দুর্ব্বলতা অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য এবং কখন কখন কাসি অনুবর্ত্তন করে। এরূপ স্থলে মকরধ্বজ—বেদানার রস সহ এবং অগ্নি তুণ্ডী – জোয়ান ও মৌরী ভিজান জল সহ কিছুকাল প্রয়োজ্য। কাসি থাকিলে শৃঙ্গারাভ্র পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ প্রয়োগ করিতে হয়।

মহর্ষি পুনর্ব্বসু আত্রেয় বলেন, "পঞ্চকর্ম্ম ও রসায়ন ঔষধ, সত্যাচরণ, সর্ব্বভূতে দয়া, দান, বলি, দেবার্চ্চন, সদ্বৃত্তির অনুষ্ঠান, প্রশম, আত্মগুপ্তি ( মন্ত্রাদির দ্বারা আত্মরক্ষা ) পুণ্যবান জনপদ সমূহের উপসেবন ( স্থান পরিবর্ত্তন ) ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচারী, জিতাত্মা, মহর্ষি, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও সাত্ত্বিকগণের সহিত সহবাস করিলে সর্ব্বপ্রকার "কালকৃত ব্যাধি'র হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অধুনা, এই সকল নিয়ম পালন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নাও হইতে পারে। তাঁহারা যদি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।

১। ক্ষুধা না লাগিলে আহার করিবেন না।

২। অত্যধিক আহার করিবেন না।

৩। প্রত্যহ তৈলাভ্যঙ্গ সেবন করিবেন।

৪। সর্ষপ তৈলের নস্য গ্রহণ করিবেন। ইহা ইনফ্লুয়েঞ্জার একটী উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ( বহু পরীক্ষিত )।

৫। প্রাকৃতিক এবং শারীরিক অবস্থা

বিবেচনা করিয়া প্রত্যহ সুখস্পর্শ জলে স্নান বা গাত্রমার্জ্জন করা উচিত।

৬। রাত্রি জাগরণ ও দিবানিদ্রা পরিহার করিবেন।

৭। বদ্ধবায়ু পরিত্যজ্য।

৮। অজ্ঞাতচরিত্র বহুলোকের সহিত একত্র আহার ও উপবেশনাদি পরিহার্য্য।

৯। দন্ত ও মুখ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ সর্ষপ তৈলের কবল ধারণ করিবেন।

১০। অগ্নিবর্দ্ধক ও বলকারক রসায়ন ঔষধ সেবন করা উচিত।

আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এই রোগের প্রতিষেধকরূপে এক প্রকার vaccineএর subcutaneous injection দিয়া থাকেন, আমাদের বিবেচনায় এরূপ injection না লওয়াই ভাল। কারণ, যে বিষকে vaccine দ্বারা নষ্ট করিতে হইবে তাহা তখন শরীরের মধ্যে উপস্থিত নাই অথচ অপর একটী বিষ শরীরে প্রবেশ করিল; তাহার বিষ ক্রিয়ায় শরীরের অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা অধিক।

---

# কতিপয় ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

[ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ]

১। সর্পদষ্ট ব্যক্তির দষ্ট স্থানের চতুর্দ্দিকে উত্তমরূপে আকন্দর দুগ্ধ বা রস প্রলেপ দিবে। পরে ৩ ফোঁটা আকন্দ দুগ্ধ কিছু ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে ঐ বটীকা জল সহ ১ বার সেবন করিবে। যদি রোগীর জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে, ঐ আকন্দ দুগ্ধ ৬ ফোঁটা ও ডিষ্টিল ওয়াটার (চোয়ান জল) ৫৪ ফোঁটা উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া শিরার মধ্যে ইন্‌জেকসন করিবে। ইন্‌জেকসন একবারের বেশী করিবে না। উপরোক্ত নিয়মে এই ঔষধ ব্যবহারে গোখুরা সর্প প্রভৃতির বিষ নষ্ট হয়।

২। কলা গাছের এঁটে বা খোলার জল, অভাবে খোলাকে থেঁতো করিয়া উহা হইতে জল বহিষ্কৃত করিয়া ঐ জল অর্দ্ধপোয়া, তুলসী পত্রের রস এক তোলা উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সেবন, অঞ্জন, নস্য এবং সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে ও মস্তকে দিবে, এইরূপ করিলে সর্প বিষ নষ্ট হয়।

৩। উন্মত্ত-কুকুরাদির দংশনে—পুনর্ণবার মূল ।০ আনা ও ধুতুরার মূল ।০ আনা উভয়

দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া কাঁচা গব্য দুগ্ধ বা শীতল জলের সহিত ক্ষিপ্ত-কুকুর ও শৃগালাদি কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তিকে সেবন করাইলে বিষ নষ্ট হয়।

৪। ক্ষিপ্ত-কুকুর-দংশনে গরম জলের সহিত ৯ মাষা পরিমাণ কালজীরা গিলিয়া খাইলে কুকুর দংশনের বিষ নষ্ট হয়।

৫। নিসিন্দা বৃক্ষের মূলের কাঁচা ছাল ২ রতি ও আতপ চাউল ১ তোলা উভয় দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া কিছু দিন সেবন করিলে হাঁপানি ও কাস আরোগ্য হয়।

৬। কাটা ঘার রক্ত বন্ধ।—কচুর ডাঁটার টাটকা রসে কাটা ঘার রক্ত বন্ধ ও কাটা ঘা জোড়া লাগে।

কচুর পাতার নীচে যে সরু ডাঁটার মত দৃষ্ট হয় ঐগুলির রস নিষ্পেষণ করিয়া লাগাইলে রক্তের স্রাব আশু রুদ্ধ হয়। ইহার রস প্রয়োগ করিবার পর ক্ষত স্থানে পূযাদি কিছু না হইয়া একবারে বিচ্ছিন্ন চর্ম্ম সত্বই সংযুক্ত হইয়া যায়।

৭। কলাপাতা পোড়ান ছাই ১ তোলা, পুরাতন তেঁতুল গাছের ছাল (যে ছাল শুষ্ক হইয়া চটা উঠিয়া গাছের সহিত লাগিয়া থাকে) পোড়ান ছাই ১ তোলা, সৈন্ধব লবণ ৩ রতি, এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া বৈকালে খাইলে অম্লপীড়া আরোগ্য হয়। যাঁহারা অম্লপীড়ার জন্য বৈকালে সোডা খাইয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে এই দ্রব্য খাইতে অনুরোধ করি। ইহা ব্যবহারে প্রাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

৮। ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক।—চিরতা, কটকী, মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ—সর্ব্বসমেত ২ ভরি, জল ⁄।॰ সের, শেষ ৵॰ পোয়া, থাকিতে নামাইয়া উক্ত ক্বাথ প্রাতে ও বৈকালে পান করিবে। যে ম্যালেরিয়া জ্বর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে ইহা সেবনে তাহা নিবারিত হয়।

৯। পারা দোষ নাশক।—ধল আঁকড়ার মূল ॥॰ আনা, অনন্তমূল ॥॰ আনা, ছাতিম ছাল ॥॰ আনা, গুগগুল্ ॥॰ আনা, জল ⁄।॰ সের শেষ ⁄॰ এক ছটাক। ইহা সেবনে রক্ত দোষ, পারাদোষ, বাত, শূল, বাতরক্ত এবং কুষ্ঠ পর্য্যন্ত ভাল হয়।

১০। বাতরোগ নাশক।—ধল আঁকড়ার পাতা বা ছাল বাটীয়া বাতের ফোলা, বেদনা কন্‌কনানি প্রভৃতিতে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

১১। স্বরভঙ্গ নাশক।—অপরাজিতার শিকড়, পাতা, লতা সমস্ত একত্র সিদ্ধ করিয়া সেই জল গরম গরম আকণ্ঠ মুখমধ্যে ধারণ করিলে গলার ঘা ও স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয়।

১২। কুলের পাতা পেষণ করিয়া ও ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধব সহ সেবন করিলে স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয়।

১৩। শিশুদিগের দুধতোলা নাশ।—টাটকা সরিষার তৈল প্রত্যহ তিন চারিবার করিয়া পেটে মালিস করিলে অথবা এক-টুক্‌রা ফ্ল্যানেল শিশুর পেটে জড়াইয়া রাখিলে দুধতোলা নিবারিত হয়।

১৪। মুতাঘাসের বীচি, আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত বাটিয়া ৩ তিন রতি

মাত্রায় কিঞ্চিত স্তনদুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে, শিশুদিগের দুধতোলা নিবারিত হয়।

১৫। আকনাদি (নিমুখী) পাতার মসৃণ পৃষ্ঠাটী গব্যঘৃত মাখাইয়া ফোড়ার ঘায়ে লাগাইলে ঐ ঘা ক্রমে শুকাইয়া যায়।

(ক) আকনাদির পাতার অপর পৃষ্ঠা অর্থাৎ শিরার দিক গব্যঘৃত মাখাইয়া ফোড়ার উপর লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

(খ) আকনাদির পাতায় ঘৃত মাখাইয়া প্রদীপ শিখায় কাজল করিয়া শিশুর চোখে দিলে তাহাদের চক্ষুঃপীড়া ভাল হয়।

(গ) আকনাদির পাতা গরম করিয়া অর্শের উপরে স্বেদ দিলে টাটানি নিবারণ হয়।

(ঘ) আকনাদির পাতা ছেঁচিয়া তাহার রস ২ দুই তোলা মিশ্রিচূর্ণ বা চিনি সহ সেবন করিলে আমাশয় ও রক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

(ঙ) আকনাদির পাতা ও কুকাসমার পাতা একত্র সমভাগে লইয়া একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস অর্দ্ধ ছটাক করিয়া দিনে ৩।৪ বার সেবন করিলে' সপূ্য রক্ত বিষাক্ত মেহ অতিশীঘ্র উপশমিত হয়। ইহাতে রক্তপিত্ত এবং অর্শ ও সারিয়া থাকে।

---

# শিশুচিকিৎসা।

চোখ উঠায়।—(১) সেওড়ার আটায় কাজল পাড়িয়া সেই কাজলের অঞ্জন দিবে। ২) ছাগ দুগ্ধের সহিত দারু হরিদ্রা, মুতা ও গেরিমাটি পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিবে। (৩) ১ রতি পরিমিত তুঁতে একছটাক পরিষ্কার জলে গুলিয়া একটি শিশিতে রাখিবে এবং ঐ জল লইয়া প্রত্যহ ২।৩ বার চক্ষুতে ছাট দিবে।

দুধ তোলায়। (১) দুধের সহিত চুণের জল মিশাইয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে উপশম না হইলে দুগ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া অল্পে অল্পে মাংস রস পান করাইবে। (২) বৃহতী ও কণ্টকারী ফলের রস কিংবা পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ—ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশাইয়া মধুর সহিত চাটিতে দিবে। (৩) আম্র কেশী, খই ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত খাইতে দিবে। (৪) টাটকা সরিষার তৈল দিবসে ৩।৪ বার পেটে মালিশ করিতে দিবে এবং একটুকরা ফ্ল্যানেল শিশুর পেটে জড়াইয়া রাখিবে।

তড়কায়। হলুদ—অগ্নিতে পোড়াইয়া কপালে অল্প অল্প তাপ দিবে। হলুদের পরিবর্ত্তে লোহ শলাকারও তাপ দেওয়া যাইতে পারে। চোখে মুখে শীতল জলের ছাট দিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় মূর্চ্ছা ভঙ্গ না হইলে নিশাদল ও চূণ একত্র মিশাইয়া শিশুর

নাকের নিকট ধরিবে। শিশুর তড়কা নানা কারণে হইয়া থাকে। অতিরিক্ত জ্বর-সন্তাপ জন্য তড়কা হইলে চোখে মুখে ও মাথায় শীতল জলের ছাট দিবে; পিঠের শির দাঁড়ায় ও মস্তকের পশ্চাৎভাগে জলের ছাট দিবে এবং জল ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে। দুর্ব্বলতার জন্য তড়কা হইলে রাই সরিষার গুঁড়া মিশ্রিত গরম জল একটি পাত্রে রাখিয়া তাহাতে হাঁটু পর্য্যন্ত পা ডুবাইয়া রাখিবে। রাই সরিষার গুঁড়া ও ময়দা একত্র মিশাইয়া শিশুর দুই পায়ের ডিমে পটি বসাইয়া দিবে। বগলে, হাতে ও পায়ে অগ্নির সেক দিবে। ক্রিমি জন্য তড়কায় হাতে সহ্য হয় এরূপ গরম জল একটি পাত্রে রাখিয়া তাহাতে শিশুর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইবে এবং আধ হাত উঁচু হইতে ধারাণী করিয়া শীতল জল তাহার মস্তকে ঢালিবে। ৫।৭ মিনিট পর্য্যন্ত এইরূপ করিয়া তাহার গা মোছাইয়া দিবে। সকল প্রকার তড়কাতেই এই সকল প্রক্রিয়ার পর দাস্ত করান উচিত। পরিষ্কৃত এরণ্ড তৈলের দ্বারা দাস্ত করান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

ক্রিমিতে।—(১) পালিদা মাদারের পাতার রস ও মধু (২) বিড়ঙ্গ চূর্ণ ও মধু (৩) ভাঁট পাতার রস ও মধু সেবন করান উত্তম ব্যবস্থা।

---

# পাশ্চাত্যমতে নাড়ীতত্ত্ব।

[ ডাঃ আর, এল, সূর, এল, এম, এস, এম, ডি ]*

"তদেব যুক্তং ভৈষজং যদা রোগ্যায় কল্পতে।
সচৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো
যঃ প্রমোচয়েৎ।"

যে দ্রব্য—রোগ আরোগ্য করে তাহাই প্রকৃত ঔষধ।

যিনি রোগ হইতে মুক্ত করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।

That alone is the right medicine which can remove disease.

He alone is the true physician who can restore health.

যে শাস্ত্র (এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজি, হাকিমি, বাইওকেমিক প্রভৃতি যে কোন শাস্ত্র) অধ্যয়ন করিলে সহজে রোগ নিরূপণ ও নিরাকরণ করা যায় তাহারই নাম রোগ নিরূপণ তত্ত্ব। রোগ নিরূপণ তত্ত্বে পারদর্শিতা লাভ করিতে না পারিলে পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। যে কোন শাস্ত্র-মতের চিকিৎসকের দেখা উচিত, কোথায়

* প্রবন্ধ লেখক ডাক্তার সূর অশীতিপর বৃদ্ধ ও প্রবীণ চিকিৎসক। ইনি কলিক্যাতা C, H, Medical College এর প্রিন্সিপ্যাল। আঃ সং।

কোন সূত্রে, কিরূপে রোগের উৎপত্তি হয়, কি উপায়েই বা তাহা নিবারিত হইতে পারে, এ সকল বিষয়ের যিনি প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন তিনিই সমস্ত, চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী হয়েন।

স্বাস্থ্যের বিপরীত অবস্থাকেই রোগ বলা যায়, সেই রোগ কোথা হইতে কি সূত্রে উৎপন্ন হইল, তাহাই চিকিৎসকের দেখা কর্ত্তব্য।

যে রোগ শারীরিক গঠনোপাদানের বিপর্য্যয়বশতঃ উৎপন্ন হয় তাহাকে যান্ত্রিক (organic) পীড়া বলে।

যে রোগ শরীরের কোন যন্ত্রের ক্রিয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন জনিত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্রিয়া সংক্রান্ত (functional) পীড়া বলে।

নাড়ী পরীক্ষায় হৃৎপিণ্ড, শোণিত এবং রক্তাবহানালী সমুদয়ের অবস্থা জানিতে পারা যায়, এই বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে অনেক স্থলে শরীরের সাধারণ অবস্থা এবং সময়ে সময়ে পীড়ার প্রকৃতিও অবগত হওয়া যায়। নাড়ী—হাতের কব্জীর নিকট ধমনীর উপর অঙ্গুলি ন্যস্ত করিলে সহজে অনুভব হয়, যেন কি একটী তেজ ধমনীকে বিস্ফারিত করিয়া থাকিয়া থাকিয়া আঘাত করিতেছে। ধমনীর এই বিস্ফারণকে নাড়ী (pulse) বলে।

এই বিস্ফারণ হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের সহিত প্রায় সমকালেই সংঘটিত হইয়া থাকে, হৃৎপিণ্ডের প্রতি সঙ্কোচনে ইহার গহ্বর হইতে সতেজে রক্তনিঃসারিত হইয়া ধমনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। যে তেজে ধমনীর ভিতর রক্ত প্রবেশ করিবে, সেই তেজের পরিমাণানুসারে তাহার অভ্যন্তরে একটী তরঙ্গ উৎপাদিত হইয়া থাকে।

এই শোণিত তরঙ্গ প্রবাহিত হইবার সময় ক্রমান্বয়ে সমগ্র ধমনী মণ্ডলের বিস্ফারণ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনে যে রক্ত তরঙ্গ ধমনীর মধ্যে চালিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত (pulse) নাড়ী।

ধমনীর উপর অঙ্গুলির চাপ দিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলে—

ভূমিষ্ঠের পর নাড়ী এক মিনিটে ১৩০ হইতে ১৪০ বার দপ দপ করে।

প্রথম বৎসরে নাড়ী ১১৫ হইতে ১৩০ বার দপ দপ করে।

দ্বিতীয় বৎসরে নাড়ী এক মিনিটে ১০০ হইতে ১০৫ বার দপ্ দপ করে।

তৃতীয় বৎসরে নাড়ী এক মিনিটে ৯০ হইতে ১০০ বার দপ্ দপ করে।

৭ম বৎসর পর্য্যন্ত নাড়ী এক মিনিটে ৮৫ হইতে ৯০ বার দপ্ দপ্ করে।

চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত নাড়ী এক মিনিটে ৮০ হইতে ৮৫ বার দপ্ দপ্ করে।

যুবা পুরুষদিগের নাড়ী এক মিনিটে ৭০ হইতে ৭৫ দপ্ দপ্ করে।

বৃদ্ধদিগের নাড়ী এক মিনিটে ৫০ হইতে ৬৫ বার দপ্ দপ্ করে।

শায়িত অবস্থার নাড়ীর দপ্ দপ্ সংখ্যা যত থাকে, বসিলে তদপেক্ষা অধিক এবং দাঁড়াইলে আরও অধিক হইয়া থাকে।

নাড়ীর এই গতির কোনরূপে ব্যতিক্রম ঘটিলে রোগের লক্ষণ বুঝিতে হইবে। দুর্ব্বল অবস্থায় সময়ে সময়ে অঙ্গুলিতে আর একটী

ঘাত অনুভূত হইয়া থাকে, ইহাকে দ্বিঘাত (dicrotic) নাড়ী বলে।

দ্বিঘাত নাড়ীর উৎপত্তি যথা ধমনী সকল সতত রক্তপূর্ণ থাকে ; এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের প্রতি সঙ্কোচনে ধমনী মধ্যে আবার শোণিত প্রবিষ্ট হয়, এই রক্ত এককালে সমগ্র ধমনীতে যাইতে পারে না, এওটা (aorta) ও ইহার যে সকল বড় বড় শাখা হৃৎপিণ্ডের নিকট আছে, রক্ত বেগে তৎসমুদায়কে বিস্ফাচিত করিয়া প্রবেশ করে, পরে হৃৎপিণ্ডের বিস্ফারণ কালে এই সকল বিস্ফারিত ধমনী সঙ্কুচিত হইয়া শোণিতের উপর চাপিয়া আসে, সেই সেই চাপে সম্মুখে ও পশ্চাতে উভয়দিকেই রক্ত ধাবিত হয়, কিন্তু তখন রক্ত পশ্চাদ্ভাগে ভেণ্টিকেলে (venticle) পুনঃ প্রবেশ করিতে পারে না, সঙ্কোচন বলে সম্মুখ ভাগেই কার্য্য করে, ইহাতে রক্ত প্রবাহে আর একটী তরঙ্গ উৎপাদিত হয়, সেই রক্ত তরঙ্গ সমস্ত ধমনীতে আবার ক্রমান্বয়ে বিস্ফারিত হইয়া যায়। এই বিস্ফারণকেই দ্বিঘাত নাড়ী বলা হইয়া থাকে, যে তরঙ্গে দ্বিঘাত নাড়ী উৎপাদিত হয়, তাহা নাড়ী উৎপাদক তরঙ্গের পশ্চাতে থাকে, সুস্থ অবস্থায় ইহা সাধারণ পরীক্ষায় অনুভূত হয় না।

দুর্ব্বল অবস্থায় কোন কোন স্থলে ইহা অঙ্গুলি স্পর্শে ও অনুভূত হয়, নাড়ীর স্বভাব বুঝিতে না পারিলে বিকৃত নাড়ীকে প্রকৃত নাড়ী বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের ঘনতা পরীক্ষা করিলে ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না।

হৃৎপিণ্ড কোন কারণে উত্তেজিত হইলে ইহার সঙ্কোচনের ঘনতায় নাড়ীর গতি সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, এই সঙ্কোচনের ঘনতায় বৃদ্ধির সহিত ইহার দ্রুততাও বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে, এজন্য ঘন নাড়ীর গতি প্রায়ই দ্রুত হয়। সুস্থ অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনায় নাড়ীর গতি সংখ্যা বাড়িয়া উঠে।

হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনে যে রক্ত-তরঙ্গ ধমনী মধ্যে চালিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত নাড়ী, এই নাড়ীর সাহায্যে সকল প্রকার পীড়া নির্ণয় করিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন রোগের আক্রমণে নাড়ীও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যথা—সূক্ষ্মা, বলবতী, পুষ্টা, দ্রুতা ও মন্দগতি ইত্যাদি। জ্বরের সময় নাড়ী দ্রুত চলে, অথচ পুষ্ট থাকে, দুর্ব্বলে নাড়ী সূক্ষ্ম, বিকারে নাড়ী সূক্ষ্ম, পুষ্ট, কখন বলবতী আবার কখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। দুর্ব্বল অবস্থায় নাড়ী বলবতী হইলে মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ বুঝায়।

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির জ্বরে নাড়ীর গতি সংখ্যা ১০০বার অতিক্রম করিয়া যত বাড়িতে থাকে তত আশঙ্কার কারণ ও রোগের অবস্থা সাতিশয় সঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে।

নাড়ীর স্পন্দন স্বাভাবিক অপেক্ষা ৮।১০ সংখ্যার কম হইলে বুঝিতে হইবে যে জীবনী শক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

নাড়ীর গতি সর্পের গতির ন্যায় বক্র হইলে —বাত রোগের লক্ষণ বুঝায়।

নাড়ীর গতি পারাবত ও রাজহংস প্রভৃতির গতির ন্যায় হইলে কফের লক্ষণ জানা যায়।

নাড়ীর গতি কাক ও ভেকের ন্যায় ধারণ করিলে পিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

নাড়ীর গতি দ্রুত বলিলে—হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন কার্য্য অল্পক্ষণে সম্পন্ন হওয়াতে রক্ত

সঞ্চালন দ্রুত ভাবে হইতেছে বুঝিতে হইবে।

নাড়ীর গতি ঘন বলিলে—অঙ্গুলিতে নাড়ীর গতি ঘন ঘন অনুভূত হইতেছে জানিবে।

নাড়ীর গতি ঘন ঘন ও দ্রুততার বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হইলে—মৃদু মন্দগতি বলিয়া জানা যায়।

জ্বরে দেহের সাধারণ উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ড ও উত্তেজিত হইয়া থাকে। তাহাতে নাড়ীর গতি সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। রক্ত সঞ্চালনের ঘনতা বৃদ্ধিতে শ্বাস প্রশ্বাসের ঘনতা স্বাভাবিক অনুপাতে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাপমান যন্ত্রের এক এক ডিগ্রী পারদ উঠিলে প্রত্যেক ডিগ্রীর জন্য দশবার করিয়া নাড়ীর স্পন্দন বৃদ্ধি হয়।

নিশ্বাস ও প্রশ্বাস প্রত্যেক মিনিটে ১৬ হইতে ২০ বার, কিন্তু প্রত্যেকবার নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত ৪ বার করিয়া নাড়ীর স্পন্দন হয়।

আরক্ত ( scarlet ) জ্বরে নাড়ীর গতি সংখ্যা যত বর্দ্ধিত হয়, অতিসারিক typhoid জ্বরে তত হয় না।

জরায়ু, মূর্চ্ছা ( Hystirieal ) প্রভৃতি স্নায়বিক পীড়ায় নাড়ীর গতি বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

জ্বরে ( fever ) পীড়ার ঘনতার বৃদ্ধি হয়। যে পরিমাণে রক্তের দূষিত ভাব ও শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে নাড়ীর গতি সংখ্যা বাড়িয়া থাকে।

নাড়ীর গতি সংখ্যা ১০০ বার অতিক্রম করিলে ভয়ের কারণ দেখা যায়, নাড়ীর গতি সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ১৬০ বার পর্য্যন্ত উঠিলে রোগীর অবস্থা অতিশয় সঙ্কটাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

স্বল্প বিরাম (remittent ) জ্বরে নাড়ীর গতি সংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, বাত ( rheumatism ) জ্বরে নাড়ীর গতি সংখ্যা সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় না।

অতিসারিক বিকার ও বাত জ্বরে নাড়ীর গতি সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অধিক ভয়ের আশঙ্কা হয়, কিন্তু আরক্ত ( scarlet ) ও স্বল্প বিরাম জ্বরে নাড়ীর গতি সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

মূত্রগ্রন্থির পুরাতন পীড়ায় ধমনীর স্পন্দন প্রধান বৃদ্ধি এবং নাড়ীর কাঠিন্য দৃষ্ট হয়।

সন্ধিবাত ( gout ), পাণ্ডু ( jaundice ) রোগে এবং স্নায়ুমণ্ডলের (nervous system) যে কোন পীড়ার নাড়ীর কঠিনতা দেখিতে পাওয়া যায়।

# রোগীর পথ্য।

( কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি )

—— :•: ——

আজকাল আমাদের দেশে পুরাতন প্রথার আহার ও আচার ত্যাগ করায় ঘরে ঘরে রোগী। কাজে কাজেই ঔষধ ও পথ্যের দরকার। ঔষধের কথা "আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকায়" অনেক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি আজ পথ্য সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। রোগা-বস্থায় ঔষধের অপেক্ষা পথ্যের প্রয়োজনীয়তা অধিক।

"বিনাপি ভেষজৈ র্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব
নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্য বিহীনস্য ভেষজানাং
শতৈরপি।"

সকল পীড়ায় যে ঔষধ খাইতে হয়, এমন নহে। তবে সুপথ্যে থাকা সকল রোগেই উচিত। পীড়তাবস্থায় কুপথ্য করিয়া কত হতভাগ্য সামান্ত পীড়া হইতে অসাধ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছে।

একটা কথা অনেকেই মনে করিতে পারেন, যে সাগু, বার্লি, এরারুট, সকল প্রকার ফুড্ ( মেলিন্সফুড্, হর্লিকস্ ফুড, ইত্যাদি ) প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে এবং রোগীরাও খাইতেছেন, ইহা অপেক্ষা পথ্য সম্বন্ধে আর কি জানিবার আছে? কিন্তু তা নয়! আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সাগু, এরোরুট প্রভৃতির নাম ও নাই। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কি আছে তাই বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

সুস্থাবস্থায় আমরা অন্ন খাই, উহা ধান্য হইতেই উৎপন্ন, সেই জন্যই পীড়িতাবস্থায় সেই ধান্য হইতে উৎপন্ন বস্তু জাত পথ্যই প্রশস্ত। কারণ যে ব্যক্তি, যে বস্তুতে অভ্যস্ত, তাহার শরীরে সেই জাতীয় বস্তুই অধিকতর ফলদায়ক হয়। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ নব জ্বরাবস্থায় ( যে সময় খাদ্য সম্যক পরিপাক হয় না ) খৈ এর মণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চিকিৎসক শিরোমণি শ্রীমচ্চক্রপাণি দত্ত সাধারণ জ্বরে প্রথম অবস্থায় ঔষধাদির ব্যবস্থা না করিয়া, পিপুল ও শুঁঠ দিয়া জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলে খৈ এর মণ্ড প্রস্তুত করিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেইরূপ অতিসারের প্রথম অবস্থার বেলশুঁঠ দিয়া জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিয়া খৈএর মণ্ড করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। জ্বর না থাকিলে উদরাময়ে চিঁড়ার মণ্ড একটী উৎকৃষ্ট পথ্য, ইহা একাধারে ঔষধ ও পথ্য। বেলশুঁঠ দিয়া ছাগ দুগ্ধ অভাবে গোদুগ্ধ জাল দিয়া খাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে ধান্যই প্রধান উপজীবী, রোগের অবস্থার সেই ধান হইতে প্রস্তুত খৈ, খৈ এর মণ্ড. চিঁড়া এবং চিঁড়ার মণ্ড পথ্য হইয়াছে। যে রোগীর দাস্ত পরিষ্কার হইতেছে না, তাঁহার খৈ খাইলে দাস্ত পরিষ্কারের সহায়তা করিবে।

যাহাদিগের খৈ ( আস্ত খৈ ) খাইলে পেট

কামড়ায়. তাঁহারা খৈ এর মণ্ড করিয়া খাইলে, খৈ এর কণা ( বা কণিকা ) বাদ দেওয়ার দরুণ পেট ব্যথা করিবে না। যাঁহারা বিলাতী ফুডের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে বলি, অধিক দামে পুরাতন খাদ্য জিনিষ খাওয়া অপেক্ষা টাটকা খৈএর মণ্ড একটু করিয়া লইতে আপত্তি কি? দামও সস্তা, উপকারিতাও অধিক এবং টাট্‌কা। যাঁহাদের বিশ্বাস, সাহেবরা এমন ভাবে প্যাক্ করিয়াছেন, যে, ৬ মাসেও টাট্‌কা থাকিবে, তাঁহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে, প্রথম দিন কৌটার ঢাকুনী খুলিলেই এখানকার জল মিশ্রিত বায়ু প্রবেশ করিয়াই পচাইয়া দিবে। খৈএর মণ্ড তৈয়ারী করিতেও কষ্টকর নহে। পরিস্কার বস্ত্র খণ্ডে খৈ বাঁধিয়া গরম জলে ৫ মিনিট ডুবাইয়া রাখিলে খুব নরম হইবে, তাহার পর চট্‌কাইয়া উক্ত গরম জল মিছরি মিশাইয়া উক্ত বস্ত্র খণ্ডে ঘর্ষণ করিলেই মণ্ড নির্গত হইবে।

জল গরম করিবার সময় উহাতে শুঁঠ, পিপুল, বা বেলশুঁঠ যে রোগে যাহা প্রয়োজ্য তাহা দিলে, ঔষধ পথ্য একত্রেই হইল। সামান্য সামান্য পীড়ায় তাহার উপর নির্ভর করিলে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে রোগমুক্ত হইতে পারিবেন। কি কি রোগে কোন দ্রব্য দিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে কিছু লিখিলাম,—

(১) নবজ্বরে অগ্নিমান্দ্য বা কফাধিক্য থাকিলে এবং সামান্য ক্ষুধা থাকিলে শুঁঠ ও পিপুল দিয়া সিদ্ধ জলে খৈএর মণ্ড করিয়া খাইবেন। মাত্রা—শুঁঠ ও পিপুল প্রত্যেক ॥০ তোলা জল ⁄২ সের শেষ ⁄১ সের। ছাঁকিয়া লইয়া উক্ত এক সের জলে খৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিয়া খাইবেন। নবজ্বরে—পিত্তাধিক্য বা গা বমি বমি থাকিলে ক্ষেৎপাঁপড়া—এক তোলা জল ⁄২ সের, শেষ ⁄১ সের ছাঁকিয়া লইয়া উক্ত জলে খৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিবেন। নবজ্বরে কোষ্ঠ কাঠিন্যে মনেক্কা বা কিস্‌মিস্ ২ তোলা জলে ⁄২ সের শেষ ⁄১ সের উক্ত জলে খৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিবেন।

(২) অতিসার বা জ্বরাতীসারে ধনে ও শুঁঠ প্রত্যেক ॥০ তোলা জল ⁄২ সের, শেষ ⁄১ সের, উক্ত জলে খৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিবেন। জ্বর না থাকিলে চিড়ার মণ্ডও দিতে পারেন। পেটে আমের জন্য যন্ত্রণা থাকিলে বেল শুঁঠ—১ তোলা জল ⁄২ সের, শেষ ⁄১ সের; উক্ত জলে খৈএর মণ্ড করিবেন। জ্বর না থাকিলে চিড়ার মণ্ডও দিতে পারেন। রক্তাতিসারে ( অবশ্য প্রথম অবস্থায় নহে ) কুড়চির ছাল—এক তোলা জল ⁄২ সের, শেষ ⁄১ সের, উক্ত জলে মণ্ড প্রস্তুত করিবেন।

প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতির আশঙ্কায় অন্যান্য রোগের যে যে দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লিখিলাম না। তবে এ প্রবন্ধ পাঠক মহাশয়গণের অনুমত হইলে পরবর্ত্তী সংখ্যায় অধিকতর বিস্তৃত ভাবে লিখিব এবং প্রত্যেক রোগের পথ্যাপথ্য লিখিব।

খৈএর মণ্ড এবং চিড়ার মণ্ড ভিন্ন আরও একটী পথ্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বহুল রূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। উহার নাম "যবাগূ"। আজ কাল আর উহার বড় প্রচলন নাই। সেজন্য বিস্তারিত ভাবে লিখিলাম না।

জ্বর ত্যাগ হইলে এবং শরীর হাল্‌কা হইলে

থৈএর মণ্ড বন্ধ করিয়া আস্ত থৈ, পল্‌তার ঝোল বা মুগের যুষ দেওয়া যায়। জ্বর ত্যাগের পর দুগ্ধ দিতে ইচ্ছা করিলে দুগ্ধ /॥০ সের এক খানি আস্ত পিপুল দিয়া সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইতে হয়, সেই দুগ্ধই থৈএর সঙ্গে দিতে হয়। জ্বরের প্রথম অবস্থায় দুগ্ধ দেওয়া অনুচিত। অনেকস্থলে দেখা যায় জ্বর হওয়ার দিনেই বা তৎপর দিবসে ডাক্তার বাবু দুগ্ধ খাইতে বলেন। তাঁহারা কেন এরূপ ব্যবস্থা করেন, সে সম্বন্ধে আমার মনে হয়, তাঁহারা বিলাতী পুস্তক পড়িয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। সেখানকার লোকেরা সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে মাংস খাইতে অভ্যস্ত। তাঁহাদের জ্বর হইলে দুগ্ধ ও রুটী লঘু পথ্য। তাই বলিয়া যে দেশের লোকেরা ধান্যকে ২।৩ বার সিদ্ধ করিয়া চাউল প্রস্তুত করিয়া, সেই চাউল প্রচুর জলে অনেকক্ষণ সিদ্ধ করিয়া, তাহার ফেন বা মাড় (যাহাতে অনেক পুষ্টিকর পদার্থ থাকে) ফেলিয়া নিত্য আহার করে; তাহাদিগকে জ্বর হইলে কি দুগ্ধ ও রুটী দেওয়া যায়?

অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রোগীর জ্বর ত্যাগের পর অন্ন পথ্য দিবার পূর্ব্বে রুটি পথ্য দেওয়া হয়। ইহাও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ গম গুঁড়া করিয়া জলে মাখাইয়া এক মিনিট বা দুই মিনিট কাল অগ্নি সংযুক্ত করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়, তাহা কখনও ভাত অপেক্ষা লঘু হইতে পারে? এদেশীয় শাস্ত্র কারগণ রুটীর বিষয় যে জানিতেন না, তাহা নহে। কারণ 'ভাব প্রকাশে' আছে।

শুষ্ক গোধুম চুর্ণেন কিঞ্চিৎ পুষ্টাং
চ পেলিকাং।
তপ্তকে স্বেদয়েৎ কৃত্বা ভূর্য্য-গারে
হপিতাং পচেৎ॥
সিদ্ধৈষা রোটিকা প্রোক্তা, গুর্ণান্
তস্যাঃ প্রচক্ষ্মহে।
রোটিকা বলকৃৎ বৃষ্যা বৃংহণী ধাতুবর্দ্ধন॥
বাতঘ্নী, কফকৃৎ, গুর্ব্বী, দীপ্তাগ্নিনাং
প্রপূজিতা॥

অর্থাৎ শুদ্ধ গম চূর্ণ করিয়া জল দিয়া মাখিয়া লেচী পাকাইয়া চাটুতে গরম করিয়া অগ্নিতে দিয়া সেঁকিয়া লইবে। রুটী—কফ জনক এবং গুরুপাক, এজন্য প্রবলঅগ্নি ব্যক্তি দিগেরই ইহা সুখাদ্য। যাঁহারা রুটি খাইয়া হজম করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে রুটী শুক্র, বৃদ্ধি ও ধাতুপুষ্টি করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে এবং বায়ু নষ্ট করে। সেই জন্যই পশ্চিম দেশীয় দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিরাই রুটীই খান। তাঁহারা বলেন যে,কেবল লঘুপাচ্য ভাত খাইলে,তাঁহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। এ হেন রুটী, রোগীকে ভাত দিবার পূর্ব্বে যে দিতে দেখা যায় তাহার কারণ কি? সাহেবী কেতাবের জ্বরের পথ্যের দুগ্ধ ও রুটীর অনুকরণ অজ্ঞাতসারে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে।

পূর্ব্বে এরূপ ছিলনা, থৈ, বেগুন পোড়া, তারপর মুগের যুষ দিয়া থৈ তারপর "ওগ্‌রা" দেওয়া হইত। দুইভাগ সোনামুগের ডাল, এক ভাগ খুব পুরাতন চাউল, হলুদবাটা, আদা বাটা, মৌরি বাটা' দুই একটা পটোল দিয়া সিদ্ধ করিয়া, রোগীর শরীরের অবস্থা বুঝিয়া সিদ্ধ করিবার সময় সামান্য পরিমাণ গব্য ঘৃত দেওয়া হইত। এবং উহাই গরম খাইতে দেওয়া হইত, এই 'ওগরা' সহ্য হইলে তৎপর দিবস ভাত দেওয়া হইত।

পথ্য সেবনের পর রোগী দিব নিদ্রা না সেবন করেন, তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইত। জ্বরের প্রথম দিন হইতেই জল অর্দ্ধেক সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পান করিতে দেওয়া উচিত। উক্ত সিদ্ধ জল যেন পর্য্যুষিত বা বাসী না হয়।

আমরা যদি প্রাচীন প্রথায় পথ্য ব্যবহার করি, তাহা হইলে রোগ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে দূর হইবে।

অদ্য প্রবন্ধে জ্বর সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ লেখা হইল। অন্যান্য রোগের পথ্য বিধান পরে লিখিব।

---

# বাঙ্গালী ছেলেদের স্বাস্থ্য।

( কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন )

—:†:—

বাঙ্গালী ছেলেরাই বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বংশধর। এই বংশধরদিগকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য—বিদ্যালয়ের বি এ, এম এ পাশ করাইবার জন্য বাঙ্গালী অভিভাবকেরা যেরূপ মনোযোগী, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাঁহারা যে সেরূপ মনোযোগী নহেন, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিয়োজিত স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতির রিপোর্ট হইতেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ গত তিন বৎসর হইতে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার ফলে ছয় হাজার ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কোনো কোনো কলেজে শত করা দশ জন ছাত্র প্লীহা বৃদ্ধি রোগে ভুগিতেছে, কোনো কোনো কলেজে শতকরা একান্ন জন ছাত্রের দৃষ্টিশক্তি কম হইয়াছে। অনেক ছাত্রের দাঁতের পীড়া প্রভৃতি আছে। তদ্ভিন্ন বহু সংখ্যক ছাত্রকে প্রকৃত প্রস্তাবে রোগগ্রস্ত বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছেন কিন্তু তাহারা যে কি ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছে, তাহা তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। মোটের উপর তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্কটিশ চার্চ্চ, ইউনিসিভার সিটি, সিটি, প্রেসিডেন্সী, সি, এম, এস, এবং বঙ্গবাসী—এই কলেজ গুলির মধ্যে শতকরা ৭১ জন ছাত্র নীরোগী নহে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতির রিপোর্ট হইতে আরও জানিতে পারা যায়, কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৭৭ জন সোজা হইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম নহে। একুশ বৎসর বয়সের পর হইতেই অধিকাংশ ছাত্রেরই স্বাস্থ্য হানি ঘটিয়া থাকে কিন্তু ১৬ বৎসর হইতেই চক্ষুরোগ, কর্ণ রোগ ও দন্ত রোগের সূচনা হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক ছাত্রের অজীর্ণ রোগের মূল কারণ দন্তরোগ, কারণ তাহার জন্য তাহারা ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইতে

পারে না। ফলকথা স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতির অনুসন্ধানের ফল অতীব শোচনীয়, বাঙ্গালী বালকের এই শোচনীয় স্বাস্থ্য হানির ফলে বাঙ্গালী জাতি যে ধ্বংসের পথে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখন ইহার কারণ কি তাহা স্থির করা যাউক। স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতি বহুসংখ্যক ছাত্রকে যে রোগগ্রস্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অথচ তাহারা কি রোগে ভুগিতেছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, সে সম্বন্ধে তাহাদের কি রোগ—তাহা আমরা বলিয়া দিতে পারি। সে রোগের মূল কারণ বাঙ্গালী ছাত্রের ব্রহ্মচর্য্য হানি। আগে পঠদ্দশায় আমাদের দেশের ছাত্রদিগকে যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত, আধুনিক শিক্ষা-সমিতির নিয়মে তাহা আর করিতে হয় না। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ অর্থকরী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। শিক্ষকের সহিত ছাত্রগণের সম্বন্ধ স্কুল কলেজে যতটুকু আবশ্যক—তাহার অধিক হইবার উপায় নাই। আমরা বাল্যকালে পণ্ডিত মহাশয়কে পথিমধ্যে দেখিলে ভয়ে কাঁপিতাম—বিশ হাত দূরে পলায়ন করিতাম। এখন ছাত্র সমাজে সে ভীতি উৎপাদনের কোনো কারণই নাই। শিক্ষক বেতন ভোগী, ছাত্র নিয়মিত বেতন যোগাইয়া তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেয়, সুতরাং বর্ত্তমান সভ্য যুগের ছাত্রগণ শিক্ষকের শাসনগণ্ডীর মধ্যে থাকিতে একান্তই নারাজ। মেসে এবং হোষ্টেলে যে সকল ছাত্র অবস্থিতি করিয়া থাকে, তাহাদের অভিভাবকগণ প্রতিমাসে নিয়মিত অর্থ প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন মাত্র, ছাত্র কলিকাতায় কি ভাবে কাটাইতেছে, তাহার চিন্তা করিবার অনেকেরই অবসর নাই। ফলে মেসে এবং হোষ্টেলে রাখিয়া ছাত্রদিগকে যে যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, তাহা হইতেই যে সকল ছাত্রের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে, স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতির অনুমিত অজ্ঞাত রোগের কারণ তদ্দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতিও কতকগুলি ছাত্রকে অজীর্ণ রোগগ্রস্থ বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন এবং ইহাও অবিসম্বাদিত সত্য যে, তাঁহাদের পরীক্ষিত ছাত্র ভিন্নও দেশের বহু সংখ্যক ছাত্রই এখন অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছে। ইহার মুখ্য কারণ—বাঙ্গালী ছাত্রের একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। যে সকল কারণে অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে, বাঙ্গালী ছাত্র সমাজে তাহার কারণ যে যথেষ্ট বিদ্যমান তাহা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদে অজীর্ণ রোগের কারণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

> অত্যম্বু পানাদ্বিষমাশনাচ্চ
> সংধারণাৎ স্বপ্ন বিপর্য্যয়াচ্চ।
> কালে হপি সাত্ম্যং লঘু চাপি
> ভুক্তমন্নং ন পাকংভজতে নরস্য ॥

অর্থাৎ অধিক জল পান, বিষম ভোজন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ এই সকল কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। এই রোগ উপস্থিত হইলে তখন উপযুক্ত সময়ে দেহানুকুল লঘু আহারও পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

ইহা ভিন্ন ছাত্র সমাজে বিদগ্ধাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণের প্রকোপ যাহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রথমটির কারণ হইল

অত্যাচারের ফলে পিত্ত প্রকোপের কারণ সংঘটন এবং দ্বিতীয়টির কারণ হইল অত্যাচারের ফলে বায়ু প্রকোপের কারণ সংঘটন। অজীর্ণ উৎপত্তির কারণে যে সকল কথা আর্য্যঋষি বলিয়া গিয়াছেন, যদি চিন্তা করিয়া দেখা যায়,তাহা হইলে প্রত্যেক-টির কারণ যে মিলান যাইতে পারে তাহাও প্রমাণ করা যায়। আমরাই সে প্রমাণ করিয়া দিতেছি।

অধিক জল পান—কলিকাতা সহরে চা, সোডা, লেমোনেড, বরফ, সরবতের বিক্রয়া-ধিক্য দেখিলে এবং এগুলি কাহারা অধিক ব্যবহার করে তাহার হিসাব করিলে বাঙ্গালী ছাত্রদিগের মধ্যেই ইহা যে অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহা অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালী ছাত্রদিগের মধ্যে অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্য জন্মিবার সর্ব্বপ্রথম কারণ হইল এইটিই। দ্বিতীয় কারণ বিষম ভোজন। ইহাও বাঙ্গালী ছাত্র জীবনে যথেষ্ট ঘটিতেছে। কলিকাতার রেষ্টরেণ্ট গুলির প্রধান ক্রেতা কাহারা—যাঁহারা তাহার খোঁজ রাখেন, তাঁহারা যে এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত হইবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি। তৃতীয় কারণ—মলমূত্রাদির বেগ ধারণ। ইহাও ছাত্র-জীবনে অনেক সময় অনেক কারণে অনিবার্য্য হইয়া থাকে। ৪র্থ কারণ—দিবা নিদ্রা না থাকুক, রাত্রি জাগরণ যে কারণেই হউক বাঙ্গালী ছাত্রের মধ্যে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে। পরীক্ষার প্রতিযোগিতার জন্য বাঙ্গালী ছাত্র রাত্রি জাগিয়া চক্ষু রোগেরও কারণ ঘটাইতেছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যকেও সাদরে ডাকিয়া আনিতেছে।

শুধু লেখাপড়ার খাতিরেই নহে, কলি-কাতায় থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখিবার জন্যও বাঙ্গালী ছাত্রের ভিড় শনি রবিবারে বড় কম দেখা যায় না। ইহার ফলে রাত্রিজাগরণে স্বাস্থ্যের অপচয় তো করা হয়ই, তা' ছাড়া হাবভাবশালিনী বারবনিতা দিগের কুটিল কটাক্ষ এবং অঙ্গ বিন্যাসেও যে অনেকে অধঃ-পতনের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন তাহাও বলা যাইতে পারে। প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নবিকার প্রভৃতি ব্যাধি সকল কুসুম সুকুমার ছাত্র জীবনে এমনই করিয়াই তো প্রবেশ করিয়া থাকে। হায়, সুদূর মফঃস্বল-বাসী বাঙ্গালী অভিভাবক এ সকল কথা একবারও চিন্তা করেন কি না তাহা আমরা জানি না।

মেসে এবং হোষ্টেলে যে সকল ছাত্র অবস্থিতি করিয়া থাকে, নিশ্চয়ই তাহারা মফঃস্বল হইতে সমাগত হইয়াছে। এখানে ইলেকট্রিকের পাখার হাওয়াই সেবন করুক, আর অর্দ্ধপোয়া পথ পর্য্যটনে ট্রাম কোম্পানীকে সাতটি পয়সা না দিলে পথ চলিতেই কষ্ট বোধই করুক, তাহারা জন্মিয়াছে এবং লালিত পালিত হইয়াছে কিন্তু সেই শ্যামল-শস্য-পরিপূরিত আম্র জম্বুর স্নিগ্ধ ছায়ায় শীতলিত ষড়ঋতু প্রবাহিত পল্লীগ্রামে। সেই পল্লীগ্রামে তাহারা জন্মিয়াছে, দুঃখকষ্টের ভিতর তাহারা প্রতিপালিত হইয়াছে। তখন তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে ডাল মাছ-ব্যঞ্জন দিয়া এক পাথর ভাত খাইতে পারিত, মুড়ি চাল-ভাজা-চিঁড়া ছোলাভাজা—তেল নুন মাখিয়া

দু'বেলা দু'কোঁচড় খাইয়া হজম করিত। আম কাঁটালের সময় একসঙ্গে ৫।৬ গণ্ডা আম, একটা আস্ত কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইয়া জীর্ণ করিবার শক্তি রাখিত। কিন্তু যেই তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য সহরে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, সেই তাহাদের হজম শক্তি কমিয়া আসিল, মেসে হোষ্টেলে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত হইলেও অর্দ্ধ ছটাক চাউলের অন্নও তাহার হজম করিবার শক্তি থাকিল না, কোনা দিন কোনো কারণে একটু বেশী আহার করিলেই বটকৃষ্ণ পালের দু'বোতল সোডা পান না করিলে তাহার ভক্ষিত অন্ন জীর্ণ হইবার উপায় থাকিল না,—এই দাঁড়াইয়াছে বাঙ্গালী প্রবাসী ছাত্রদিগের অবস্থা। এই অবস্থার জন্যই তো স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতি বহু সংখ্যক ছাত্রকে অজ্ঞাত রোগাক্রান্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

এখন ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা কি? বহুকালাবধি চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী থাকিয়া আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে সত্যই বাঙ্গালী ছাত্র দিগের অধিকাংশই নানারূপ ব্যাধিগ্রস্থ। সর্ব্বাপেক্ষা এই সমাজের প্রবল ব্যাধি শুক্র সম্বন্ধীয় পীড়া। শুক্র সম্বন্ধীয় পীড়া বলিলেই যে তাহারা গণোরিয়াগ্রস্থ বুঝিতে হইবে—তাহার কোনো কারণ নাই। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, আয়ুর্ব্বেদে প্রমেহ বিংশতি প্রকার। ছাত্রজীবনে যে অজীর্ণের কথা বলিয়াছি, বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে—সেই অজীর্ণ নিজে একটি স্বতন্ত্র রোগ না হইয়া এই প্রমেহেরই অন্তর্গত হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদে কফজ মেহে—আহারের অপরি-পাক, অরুচি, বমি এ কয়টি বিশেষ উপসর্গ। বাতজ মেহে উদাবর্ত্ত একটি বিশেষ উপসর্গ। কাজেই ছাত্রজীবনে কাহারও অজীর্ণ হইয়াছে শুনিলে তাহার মূল কারণ প্রমেহ কিনা তাহা চিন্তার বিষয়। তাহার পর স্বপ্নবিকার—যৌবন স্বভাবসুলভ ব্যাধি হইলেও স্ত্রীজাতির চিন্তনে এই রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদের যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে শতকরা অর্দ্ধেকের উপর ছাত্র এই রোগে আক্রান্ত। ফলকথা সহরের বিলাস সম্ভারের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা বড়ই সমস্যার কথা। তাহার পরে অভিভাবক শূন্যাবস্থায় ইচ্ছা-শক্তিকে প্রতিহত করিবার কেহই নাই। এইজন্য বাঙ্গালী বালককে বাঁচাইতে হইলে বাঙ্গালী অভিভাবককে শুধু অর্থ পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, যে পর্য্যন্ত কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ না রাখিয়া ছাত্রের কার্য্য কলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করা না হইবে -সে পর্য্যন্ত যে সুফলের আশা করা যাইবে না—তাহা সুনিশ্চিত।

বাঙ্গালী ছাত্র সমাজে স্বাস্থ্যহানির আর একটি কারণ, এখনকার উপন্যাস বা নভেল পাঠ। এই নভেলে শুধু ছাত্র সমাজ নহে, বাঙ্গালী মহিলা সমাজেরও বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে। বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যহানির যতগুলি কারণ অধুনা বিদ্যমান, তন্মধ্যে এই নভেল পাঠে নভেলিয়ানা ভাবে অভ্যস্ত হওয়া তাহার অন্যতম। এই নভেলি কথা কহিয়া বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্য হীনতার কথা বুঝাইতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়, সুতরাং সে কথা আপাততঃ আর অধিক না বলিয়া

আমরা এ সম্বন্ধে একটু ইঙ্গীত করিয়া রাখিলাম মাত্র, সে বিষয়ের সমালোচনা আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে করিব। ফলকথা বাঙ্গালী ছাত্র দিগের অভিভাবক দিগকে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহাদের বংশধর দিগকে স্বাস্থ্য সুখ প্রদানের অভিলাষ রাখিলে, তাহাদিগকে নীরোগী ও দীর্ঘায়ু দেখিয়া আনন্দ বর্দ্ধনের কামনা রাখিলে তাহাদিগের দুর্ব্বল চিত্ত যাহাতে বিলাসিতায় মুহ্যমান হইয়া না পড়ে, তাহার ব্যবস্থা আগে করিতে হইবে। কলেজি শিক্ষা দিতে হইলে সহরে না রাখিলে উপায় নাই—ইহা সত্য কথা, কিন্তু তাহার ফলে যাহাতে তাহার স্বাস্থ্যের অপচয় না ঘটে তাহা তো সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালনের জন্ত বাঙ্গালী অভিভাবক চিন্তা করুন ইহাই আমাদের বক্তব্য।

---

# কলের জিনিস—নমস্কার।

শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, বি, এ,

পল্লী হ'তে পাঠাই মোরা
ধোয়া, বাছা, ঝাড়া গম—
সোণার বরণ, পরিপাটী,
কাঁকরশূন্য, মনোরম।
কিন্তু যখন কলে পিষে
ময়দারূপে দেন গো দেখা,—
বস্তাবন্দী সে যে কি চীজ,
বলতে নারি, না যায় লেখা।
এক, দুই, তিন মার্কা আবার—
যার যা খুসী লওরে ভাই;
( কিন্তু ) সবার ভিতর অল্প অধিক
আছে ভেজাল—ভস্ম ছাই।
'ডাল রুটিখাও' বলেন যাঁরা
বাঙ্গালীকে ক'র্‌তে বীর;
একটিবার কি ভাবেন তাঁরা
হ'য়ে সুস্থ, ঠাণ্ডা, ধীর।
ডাল খাবে কি গরীব লোকে—
ভাত জুটেনা পেটভরা;
মলিন মিশ্র পচা ময়দা
যৌবনেতে আনে জরা।
বুকজ্বালা যে কেন এত,
পাথুরি, অর্শ, আমাশয়,—
দেশটা হ'ল হাঁসপাতাল গো,
ভাব্‌ছেন কি কেউ মহাশয়?
এর প্রতিকার ক'র্‌লে তবে
বাঙ্গালী হবে সুস্থ—সবল;
( নহিলে ) বুদ্ধিজীবী বায়স চতুর
চিররোগী হইবে কেবল।
দেহশূন্য আত্মরাম
পায় কি কেহ বীরের মান?
আজিকার এই কলের যুগে
মিছরী বাবুর নাহি স্থান।
লুচি ভাজার গন্ধ পেলে
উঠ্‌ত প্রাণটা লাফিয়ে নেচে;
গব্যঘৃতে ময়দা খাঁটি—
আহা! পেলে যাই গো বেঁচে!!

এখন কিন্তু পচা ঘি-তেলে,
ভেজাল ময়দা সহযোগে,
মড়াপোড়া গন্ধ ছাড়ে
লুচি, কচুরি, মোহন ভোগে !!
কেমন খাসা কাজলি আকের
গুড়—আহা কি মধুর তার।
মধু ফেলে খাই যে শুধু
সন্দেশও গো মানে হার !!
এ গুড় যখন 'শুদ্ধ' হ'য়ে
কলের করাল কবল থেকে
বাহির হন গো চিনিরূপে
শাদা ফরসা রঙ্গে ঢেকে;
সে সুতার আর নাই ত তখন,
কেমন যেন বেরসিক ;—
শাদার ভিতর এত গলদ !
ধবল শুভ্রে শত ধিক্ !!
এ সভ্যতার মাকাল শোভা,
চোখভুলান ফক্কিকার;
অন্তরেতে গরল রাশি—
বাহ্যচটক খুশ্ বাহার।
যমদূত ওগো ভেজাল দুধ,
অগণিত ব্যাধির মূল ;—
শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ
যকৃৎরোগের হেতুর স্থূল।
কলের আটার রূপে মজে'
কি ঝকমারি করেছি ভাই !
( এখন ) বল্ গো কোথা যাঁতা ভাঙ্গা
মোটা মিঠা ময়দা পাই ?
ভেজাল নোংরা পচা খাবার –
রোগের আকর খাবনা আর ;

প্রাণের দায়ে সব ছেড়ে গো
শাক চর্চ্চরী করেছি সার !
কল কারখানার দেশে রে ভাই
নৈতিক হাওয়া পচে গেছে ;—
স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন
শাস্ত্রে নিষেধ ক'রে দেছে।
সভ্যযুগের আলোর মাঝে
লুকিয়ে আছে অন্ধকার ;—
স্বার্থ ল'য়ে কাটাকাটি,
কামড়াকামড়ি অনিবার।
ফিরে আসুক প্রাচীন যুগের
মোটা কাপড় মোটা ভাত ;
প্রেমে করব গলাগলি
ঘুচে যাবে রক্তপাত।
হাল চালাব নিয় হাতে—
বুনব কাপড় আপনার ;
পূতপল্লী-তপোবনে
লুট'ব কত সুখের ধার।
স্বাবলম্ব হারিয়ে ফেলে
কলের অধীন হইছি ভাই ;—
উঠ্‌তে বস্‌তে হাঁচ্‌তে সদা
কলের অনুগ্রহ চাই।
কলে হাসি, কলে কাঁদি
কলে রাঁধি, কলে খাই ;
জীবন মরণ কাঠি যে কল—
এই আছি আর এই গো নাই।
সভ্যযুগের সাদা, মিহি,
ফরসা, সরু, পরিস্কার,
বিষ খেয়ে যে জ্বলে মরি—
কলের জিনিস—নমস্কার!

# পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচন।

( শ্রীআশুতোষ রায়এল-এম-এস, )

:•:

## এ্যালেক্‌জেন্দ্রিয়ার শিক্ষা মন্দির ( Alex an drian School. )

খ্রীষ্টীয় জন্মিবার ৩৩১ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট এ্যালেক্‌জাণ্ডার (Alexander) নিজ নামে এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গম স্থানে মিশর প্রদেশে এ্যালেক্‌জেন্দ্রিয়া নামক নূতন নগর স্থাপন করেন। গ্রীক্ সভ্যতার অবনতির ( declive Greek culture ) পর এই নূতন নগরে সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের চর্চ্চা ও উন্নতিসাধন হয়। কস্ ( cos ) হইতে হিরোফিলাস্ ( Herophilus ) এবং সিনিডস্ ( cnidos ) হইতে ইরেসিস্‌ট্রেটাস্ ( Erasistratus ) মিশর দেশের নূতন নগরে আগমন করতঃ চিকিৎসা-শাস্ত্রাগার স্থাপন করেন। এইরূপে চিকিৎসার দুই মতই মিশর দেশে প্রচারিত হয়।

এ্যালেক্‌জেন্দ্রিয়ার শিক্ষা মন্দিরে (Alexanderian school ) শব ব্যবচ্ছেদের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় ও ক্রমে অনেক উন্নতি হয়। শল্য চিকিৎসা ( Surgery ) এবং ধাত্রী বিদ্যার ( obslitries ) এত উন্নতি হয় যে তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের ঐ সব বিষয়ের প্রায় সমকক্ষ।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদে বৃদ্ধ সুশ্রুত ইহার বহু পূর্ব্বে শব ব্যবচ্ছেদের আবশ্যকতা, শরীরের অবয়বের বর্ণনা শল্য চিকিৎসা, ধাত্রী কৌমার বিদ্যা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এ্যালেক্‌জেন্দ্রিয়েন্ স্কুলের অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে।

ডাক্তার হরন্‌লি ( Dr. Hournle ) তাঁহার হিন্দু অষ্টিয়লজি ( ostriology ) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হিন্দুরা শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া কিরূপে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ( Probably it will come as a surprise to many, as it did to myself, to discover the amount of anat omical knowledge which is disclosed in the earlier medical works of India. Its extent accuracy and are surprising, when we allow for their early age.

ডাক্তার ওয়াইস্ ( Dr. wise ) তাঁহার Commenetary on the Hindu system of medicine এ লিখিয়া গিয়াছেন যে হিন্দু চিকিৎসকগণ শব ব্যবচ্ছেদের আবশ্যকতা সম্যক্ উপলব্ধি করেন ও তজ্জন্য শরীরের সম্যক্ জ্ঞানলাভ করেন। ( Hindu Philosophers deserve the credit of having entertanied sound and philosophical views respecting the uses of the dead to the lioing were the first scientific & successful cultivators of the most im portant and essential of all department of medical knowledge viz Practical Anatomy ).

এক্ষণে আমরা হিরোফিলাস্ এবং ইরেসিস্‌ট্রেটাস সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব।

**হিরোফিলাস্** ( Herophilus —Bc 335 to 280 ) পাশ্চাত্য চিকিৎসা জগতে ইনি এ্যানাটমি ( Anatomy ) শাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন জন্য বিখ্যাত।

ইঁহার বিশ্বাস চন্দ্রমণ্ডলে ( 4th venticle of the brain ) আত্মার ( Soul ) স্থান সম্বন্ধে যাহা বিবরণ লিখিত আছে নিম্নে সংক্ষেপে তাহা বর্ণিত হইল।

"সহস্রদল কমলের" ( Brain with its innumerable folds ) "মূলদেশে" ( medulla ablongata ) যেখান হইতে "সুষম্না নাড়ীর ( Spihal cord ) আরম্ভ তাহার উপরে একটী ত্রিকোণ বিশিষ্ট "যোনি মণ্ডল" ( Pons varolli ) অবস্থিত। এই যোনি মণ্ডলের ভিতরে "চন্দ্র-কলা" ( choroid Plexus ) হইতে "অমৃতধারা" ( coerbro-spinal fluid ) সদা সর্ব্বদা নির্গত হইয়া শরীরকে স্নিগ্ধ করিতেছে। এই চন্দ্র কলা যেস্থানে অবস্থিত তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ স্থানের নাম "চন্দ্র-মণ্ডল" ( 4th ventricle covered by optric Ihalamns, corpus striatum and other basal ganglia of the Brain ). ঐ চন্দ্রমণ্ডলের ( optic thalamus ) ভিতর "নির্ব্বাণ-কলা" অবস্থিত, যাহাতে "নির্ব্বাণশক্তি" অন্তর্নিহিত আছে। যোগিগণ যোগ সাধন পূর্ব্বক ঐ শক্তি লাভ করেন। তখন উহার ভিতর "শিবস্থান" নামক শক্তি স্থান ( centre ) সাধকের মস্তিষ্কের ভিতর উদ্দিপ্ত হয়। সাধক তখন মুক্তিলাভ করেন। সাধকের আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়।

২। ইরেসিসষ্ট্রাস ( Erasistratus Bc. 280 ) হিপোক্রেটাসের সম সাময়িক ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন না। ইনি দোষ ( Humour ) রোগোৎপত্তির কারণ বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। ইনি এম্ পিরিক্ মতাবলম্বীর অগ্রণী। ইহাঁর মতে রোগোৎপত্তির কারণ শরীরের পরমাণুগণ ( atoms ) শাস্ত্রে এক প্রকারে মিলিত ও রোগে অন্যরূপে মিলিত হয় ( the particular way in which the ultimately indivisible mol.ues come together ) ইংরাজিতে ইহাকে Atomistie or mechanical Theory of the causation of disease

## Roman Medicine.

এ্যালেকজিন্দ্রিয়ার অবনতির পর রোমক চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি আরম্ভ হয়। রোম যখন গ্রীসকে পরাজয় করিল, গ্রীক জ্ঞানালোক ধীরে ধীরে রোমকের মধ্যে প্রবেশ করিল। গ্রীক পণ্ডিতগণ রোমে আসিয়া জ্ঞানালোক প্রকাশ করিলেন।

এসক্লিপিয়েডাস ( Asclepiadus of Prusa Bc. 124 ) রোমের প্রথম গ্রীক ডাক্তার। ইনি হিপোক্রেটাসের "হিউমারাল" প্যাথলজি বিশ্বাস করিতেন না। ইনি "এমপিরিক" মতাবলম্বী ছিলেন ও তাঁহাদের "এ্যাটমিষ্টিক" (Atomistic theory) থিওরি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

ইহাঁর মতে শরীরের পরমাণু ( atones indivisible moleculers ) সংখ্যাতে ( number ) অবয়বে ( size ) ব্যবস্থায় ( arrange ment ) গতিতে ( movement ) পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া রোগোৎপাদন করে। ইহাঁর মতে স্বাভাবিক ক্রিয়া ( Nature ) অপেক্ষা চিকিৎসা রোগ নিবারণের অধিক সক্ষম।

আমরা এ পর্য্যন্ত দুইটী ভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসকের দলের কথা উল্লেখ করিয়াছি।

১। ডগ্‌মেটিষ্ট, লজিকেল বা র‍্যাসন্যাল্ Dog matists Logical or Rational).

২। এমপিরিক্স ( Empirics).

রোমে আরও তিনটী ভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়।

৩। মেথিডিষ্ট ( methodist. )

৪। নিউম্যাটিক্ ( numatict )

৫। একলেকটিক্স ( Eclectics )

৩। মেথডিষ্ট (Methodist)

এস্‌ক্লিপিয়েড়াসের শিষ্য থেমিসন্ ( Themisor of Loadicea B. C. 150 ) মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ে প্রথম। ইনি এম্‌পিরিক্সদের অ্যাটমিষ্টিক থিয়রির আরও বিশদ ব্যাখ্যা করেন। ইহার মতে ইহার গুরুর ন্যায় রোগোৎপত্তির কারণ শরীরের পরমাণুর পরিবর্ত্তন। ইনি বলেন পরমাণু সংযোগে দৈহিক উপাদান ( Tissue ) গঠিত হয়, কিন্তু দৈহিক উপাদান গুলি ছিদ্র বিশিষ্ট ( full of pores ) এই ছিদ্র গুলির তিনরূপে পরিবর্ত্তন হইয়া রোগোৎপাদন করে।

১। ছিদ্রগুলি শিথিল হইয়া ( Relaxation or Flex )

২ ,, সঙ্কীর্ণ হইয়া ( Contraction or Stasis )

৩। ,, মধ্যবস্থা ) Mixed state, some contracted, some relaxed )

ইহার ফলে ছিদ্র হইতে যে রস ( secreteion ) নির্গত হয় তাহা রোগোৎপাদনের করেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এই মত একেবারে বিস্মরণ হইতে পারেন নাই। তাঁহারা কতকগুলি রোগের অবস্থার কারণ রক্তবাহিনী শিরার প্রসারণ ও সঙ্কুচন ( vaso-dialatation and vaso constsiction ) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেদনা ও দাহ সংযুক্ত স্ফীতি-জনিত রোগ ( Ih inclamator disease ) বলা যাইতে পারে।

দৈহিক উপাদান গুলি পরমাণুর দ্বারা গঠিত বলিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ স্বীকার করেন। থেমিসন্ সে গুলিকে পরমাণু ( indivisible molccules or atoms ) বলিয়াছেন, আজকাল উহাকে প্রোটোপ্লাজেমিক সেল্ ( Protoplasmic cell ) কহে।

৪। নিউম্যাটিষ্ট (Pneummatist)

এথিনিয়াস ( Athenius of celicea A. D. 69 ) সম্প্রদায়ের প্রথম। ইহার মতে নিউমা ( বায়ু—Pneuma ) সকল রোগের কারণ। ইহাঁদের মতে রক্ত চলাচলের শিরার ( artery ) প্রসারণ ও সঙ্কুচনে বায়ু বিভিন্ন দিকে যাইয়া রোগোৎপাদন করে।

ইহাঁদের শাস্ত্রে তিন প্রকারের নিউমার" বর্ণনা আছে :—

১। vital spirit—যাহা শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত করে ( Inspired air )। যাহা আধুনিক শাস্ত্রে অক্সিজেন ( oxygen ) নামে খ্যাত। ইহাঁরা বলেন ইহা আরটারির ( artery ) ভিতর দিয়া গমন করে।

২। Natural Spirit—ইহা "ভেনের (vein) ভিতর দিয়া সুষুপ্ত অবস্থায় ( Subconscious state ) ক্রিয়ার কর্ত্তা।

৩। Animal Spirit—ইহা নার্ভের ( Nerve ) ভিতর দিয়া গমনাগমন করে এবং জাগ্রত অবস্থায় ( concious states ) ক্রিয়ার কারক।

Natural Spirit আধুনিক্ পাশ্চাত্য সিম্প্যাথেটিক্ নার্ভের ( Sympathetic Nerve ) ক্রিয়ার সহিত এবং vital Spirit সেরিব্রো স্পাইন্যাল নার্ভের ( ceretro Spinal Nerve ) ক্রিয়ার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

ইহা ব্যতীত ইহাঁদের মতে প্রত্যেক অণু ( Element ) ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট। চারি প্রকার গুণের উল্লেখে আছে—উষ্ণ ( Hot ) শীতল ( cold ) দ্রব ( moist ) ও শুষ্ক ( dry )। অণুগুলি বিভিন্ন বা বিরোধী গুণ বিশিষ্ট হইলে শরীরকে অস্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত করে অর্থাৎ রোগের উৎপাদন করে। যথা :—

১। উষ্ণ ও শুষ্ক গুণ অণুতে মিলিত হইয়া তরুণ রোগ ( acute disease ) উৎপাদন করে।

২। শীতল ও দ্রব যাপ্য রোগ (chronic disease ) উৎপাদন করে।

৩। শীতল ও শুষ্ক মানসিক দৌর্ব্বল্য, মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন করে।

৫। একলেক্‌টিক্স্ (Eclectics)

এই সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ পূর্ব্বলিখিত ৪টী বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিয়া যাহার যেটী সত্য মনে করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করতঃ এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। ইহাঁদের মধ্যে গ্যালেন বা জালিনুস (clandias Galenus) শীর্ষস্থানীয়। গ্যালেনের সময় পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নতির চরম অবস্থায় পরিণত হয়। গ্যালেনের পুস্তক গুলি পাঠে পুরাতন চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়া যায়। ( crytilisation of Greek and Roman medicine. )

# আয়ুর্ব্বেদ

৭ম বর্ষ } ভাদ্র ১৩৩০ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

## স্বাস্থ্যদর্পণ।

( বৈদ্যরত্ন কবিরাজ ৺কালিদাস বিদ্যাভূষণ )

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে অভিজ্ঞতা লাভ না করিতে পারিলে শরীরকে ভাল রাখা বড়ই কঠিন। পীড়িত হইয়া শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার না করিয়া পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া বুদ্ধিমানদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে প্লেগ, ওলাউঠা, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বহু রোগের প্রাদুর্ভাব দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। কখন্ কোন্ রোগ কাহাকে আক্রমণ করে, তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে দেশ, কাল ও দেহের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া হিত বস্তু সেবন ও অহিত বস্তুকে পরিবর্জ্জন করিলে রোগজন্য বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। শীত প্রধান দেশে যাহা হিতকর, উষ্ণ প্রধান দেশে তাহাই অহিতকর। সুতরাং দেশভেদে আহার ও আচারের পার্থক্য হইয়া থাকে। ঋতুভেদেও আবার ঐ আচারের তারতম্য করিতে হয়। আমাদের দেশে ছয় ঋতুর যেরূপ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ ছয় প্রকার ঋতু কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। এজন্য শীতোষ্ণ বর্ষা ভেদে আহার বিহারেরও পার্থক্য করা উচিত। আবার দেহও সকলের একরূপ নহে, একজনের দেহে বিলক্ষণ শৈত্য ( শীতল ক্রিয়া ) সহ্য হয়, অন্য দেহে ঠাণ্ডা একেবারেই সহ্য হয় না। সুতরাং কোন দেহ কি ভাবে উৎপন্ন, তাহাও নির্ণয় করিতে হইবে। সুতরাং দেশ, কাল ও দেহ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সেই আয়ুর্ব্বেদ হইতে স্বাস্থ্যোপযোগী করিয়া সরলভাবে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রকাশ করিব। ধন, মান, খ্যাতি লাভ করিয়া স্বাস্থ্যসুখে

বঞ্চিত হইলে জীবন অশান্তিময় হয়,আর অব্যাহত স্বাস্থ্যলাভের পর ধনমানাদি লাভ বিপুল শান্তিপ্রদ হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ এই শান্তির-চিরপক্ষপাতী। আমরা আয়ুর্ব্বেদ হইতে সেই শান্তিপ্রদ উপদেশগুলি পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই যাহাতে সেই শান্তিলাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য যত্নবান হইয়াছি। মহাজন বাক্য যথা—

প্রেমানন্দে পুলকিত সুশীতল মন,
নিজানন্দ দিতে পরে ব্যাকুল এখন।
মিটেছে বুভুক্ষা যার, প্রফুল্ল আনন তার,
পর ক্ষুধা মিটাইতে সে পারে তখন,
ভিক্ষুকের ঘরে কোথা ধন বিতরণ ?

## স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কর্ত্তব্য।

প্রত্যহ প্রত্যূষে অর্থাৎ ( সূর্য্যোদয়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে ) শয্যাত্যাগ করা উচিত। কারণ ঐ সময়ে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে আমাদের মানসিক বৃত্তির সম্যক বিকাশ হয়, সে সময় নিদ্রাভিভূত হইলে সে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে বাধা জন্মে, এজন্য প্রাতে নিদ্রা যাওয়া প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ, এবং শরীরের জড়তা সম্পাদক। ইহা বোধ করি অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে প্রত্যূষে অধ্যয়নে যেরূপ মনঃসন্নিবেশ হয়, অধিক বেলা হইলে সেরূপ হয় না। তবে অনেকে অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাতঃকালে নিদ্রা সেবন করেন। ইহা স্বাস্থ্যবিধি বিরুদ্ধ হইলেও চিরাভ্যাস বশতঃ আপাততঃ ক্ষতিকর না হইলেও পরিণামে অনিষ্টদায়ক হইয়া থাকে।

শয্যাত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল শারীরিক ভাবের পর্য্যালোচনা করা উচিত। অদ্য আমার শরীর কিরূপ অর্থাৎ কোনরূপ ভার বোধ, অজীর্ণ বা সর্দ্দি প্রভৃতি হইয়াছে কিনা পর্য্যালোচনা করিলে বহু সময় নষ্টকর ও ক্লেশকর রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এজন্য মনে করুন—কোন ব্যক্তি মধ্যাহ্নে অন্নাহারের পর জ্বরাক্রান্ত হইলেন; কিন্তু যদি তিনি প্রাতে শারীরিক ভাব পর্য্যালোচনা করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতেন যে, অদ্য আমার শরীর ভার হইয়াছে, অদ্য স্নান ও আহারাদি করা উচিত নহে।

নিত্য শরীরের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে যে, তাহার ফলে অনেকে পীড়া হইবার পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতিকারে যত্নবান হইতে পারেন। কোন ব্যক্তি যদি নিত্য মেঘের বিষয় পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে এক বৎসরের পর তাঁহার এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিবে যে, তিনি মেঘ দেখিয়া জল হইবে কিনা—ইহা নিরূপণে প্রায়শঃ কৃতকার্য্য হইবেন—ইহা দেখা গিয়াছে। শারীরিক পর্য্যালোচনার পর দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য। দন্তকাষ্ঠ অর্থাৎ দাঁতন দ্বারা নিম্ব, আম, সেওড়া, ভেরাণ্ডা প্রভৃতি গাছের দাঁতন লইবেন। মুখধাবন করা প্রশস্ত। কারণ দন্তকাষ্ঠের সাহায্যে দন্তমার্জ্জন করিলে দণ্ড কাষ্ঠ চর্ব্বণ জন্য দন্তের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। অনুশীলন ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের উন্নতি হয় না। পূর্ব্বকালে সকলে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার ও চালভাজা প্রভৃতি চর্ব্বণ করিতেন, এজন্য বৃদ্ধ বয়সেও দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করিতে পারিতেন। অধুনা প্রায় সকলেই অতি ব্যস্ততাসহ ভোজন করেন,ভালরূপে খাদ্য চর্ব্বণ করেন না, এজন্য দন্ত দৃঢ় হয় না এবং বৃদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই দন্তহীন হইয়া থাকেন।

তবে যাঁহাদের দন্ত বেষ্টনী অর্থাৎ দাঁতের মাড়ীতে কোন ক্ষত আছে বা রক্ত পড়ে, তাঁহারা মঞ্জন দ্বারা মুখ ধাবন করিবেন। রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল নির্ম্মিত জিহ্বা-নির্লেখনী দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার করা উচিত।

তদনন্তর মল মূত্রাদি ত্যাগ করা উচিত। শৌচাদির পর ব্যায়াম করা উচিত। নিত্য ব্যায়াম করিলে শরীরের পেশী সকল দৃঢ় হয়, কর্ম্ম-সামর্থ্য জন্মে। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির পরিপাক বৃদ্ধি হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ জীব মাত্রেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এজন্য অতি মৃদু ব্যায়াম অথবা ব্যায়াম না করা উচিত।

ব্যায়ামের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তৈল মর্দ্দন প্রশস্ত। নিত্য তৈল মর্দ্দন করিলে ত্বকের চিক্কণতা ও শরীরে দৃঢ়তা জন্মে। তদনন্তর স্নান করিবেন। মধ্যাহ্নে স্নান অপেক্ষা প্রাতে স্নানই শরীরের পক্ষে হিতকর। কারণ মধ্যাহ্নে সূর্য্যের উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জীব মাত্রেরই শরীর উষ্ণ হয়; সে সময় স্নান করিলে উষ্ণের পর শীত সেবন করা হয়। উহা স্বাস্থ্য বিধি বিরুদ্ধ।

অত্যন্ত রৌদ্রের উত্তাপ হইতে আসিয়াই স্নান করিলে রক্ত দূষিত হয়। কারণ রক্ত—উষ্ণ প্রাকৃতিক, উত্তাপে উহার উষ্ণতা আরও বাড়িয়া যায় এবং সেই সময় সহসা শীতল জল দ্বারা স্নান করিলে রক্তের গতির বাধা জন্মে। সেই আবদ্ধ রক্ত শীতল হওয়াতে উহা দূষিত হইয়া পড়ে।

সেইরূপ মধ্যাহ্নে শরীরে রক্তের উষ্ণতা বাড়ে, এজন্য স্নান হিতকর নহে। দিবাকে তিন অংশে বিভাগ করিয়া প্রথমাংশকে পূর্ব্বাহ্ন, দ্বিতীয়াংশকে মধ্যাহ্ন এবং শেষ অংশকে সায়াহ্ন বলা হয়। ভোজন—মধ্যাহ্নেই প্রশস্ত। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, মধ্যাহ্নে মানব-দেহের উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, এজন্য এ সময় পরিপাক শক্তির বৃদ্ধিভাব ঘটে, সেই সময় ভোজন করিলে খাদ্য শীঘ্র জীর্ণ হয়। পূর্ব্বাহ্নে আহার করা উচিত নয়।

অধুনা কিন্তু কার্য্যানুরোধে অনেককেই ৯টা বা তাহার পূর্ব্বেও আহার করিতে হয়। তাঁহারা অভ্যাস বশতঃ পূর্ব্বাহ্নে ভোজন করেন, তাঁহাদের ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না, কারণ যে বিষয়ে বহুদিন অভ্যস্ত, তাহা অভ্যাস বশতঃ সহ্য হইয়া যায়। মধ্যাহ্ন আহারের অন্যূন ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে জলযোগ করা উচিত নহে। একটী খাদ্য ভোজনান্তর জীর্ণ না হইলে ভোজন করা অনুচিত। ২ ঘণ্টায় একটী খাদ্য সম্পূর্ণ জীর্ণ হইতে পারে না। পূর্ব্বাহ্ন ও সায়াহ্ন—ভোজন কাল নহে। তবে যাঁহারা প্রাতে ও বৈকালে জলযোগ করেন, উহা চির অভ্যাসের ফল। আজন্ম ঐ সময় ভোজন করেন বলিয়া ক্ষুধার্ত্ত হন এবং ভোজনান্তে বিশেষ অজীর্ণও হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষ উষ্ণ প্রধান দেশ, এখানে ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ। এখানে মধ্যাহ্নে ১ বার ও রাত্রে ১ বার প্রত্যহ ২ বার ভোজনই প্রশস্ত।

পূর্ব্বে ব্রহ্মচারীগণ উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য ভোগ করিতেন। তাঁহাদের ভোজনবিধি দিবা-রাত্রির মধ্যে একবার কেবল মধ্যাহ্নকালে নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা একাহারী ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ মতে আহারই দেহের স্বাচ্ছন্দ্য দায়ক।

বারংবার অল্প মাত্রায় ভোজন করা উচিত—

এ শিক্ষা পাশ্চাত্য জ্ঞানীগণের নিকট হইতে এদেশে আসিয়াছে। তাঁহারা বহু পরীক্ষান্তে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আয়ুর্ব্বেদ সম্মত নহে কেন?

ভারতবর্ষ উষ্ণ প্রধান দেশ এবং প্রাকৃতিক বিভিন্নতা হেতু ইউরোপীয়গণের পক্ষে যাহা হিতকর আমাদের সম্বন্ধে তাহাই হিতকর হইতে পারে না। মদ্য উষ্ণকর বলিয়া ইউরোপীয়গণের নিত্য সেব্য, কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে তদ্বিপরীত অর্থাৎ শৈত্যকর ভাব হিতকর।

আয়ুর্ব্বেদেও আছে যে, শীতকালে সাধারণতঃ সকলেই অধিক পরিমাণে বস্ত্রাদির দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া শরীরের তাপ রক্ষা করিবেন। গাত্রাবরণাদির দ্বারা তাপ নিরুদ্ধ হওয়ায় শীতল বায়ুর সংস্পর্শবশতঃ শারীরিক তাপ বহির্গত না হইয়া শরীরেই অবস্থান করে বলিয়া পরিপাক শক্তি সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্রই জীর্ণ হয়। জীর্ণান্তে যদি পুনর্ব্বার খাদ্য না পায়, তাহা হইলে দৈহিক অপরাপর ধাতুকে ক্ষয় করে, এজন্য শীতকালে গুরুদ্রব্য ভোজন ও অধিক বার ভোজন হিতকর। ইউরোপে অধিক সময়ই প্রবল শীত থাকে। এজন্য সেখানে অধিকবার ভোজন স্বাস্থ্যকর।

এখানে বৎসরের মধ্যে প্রায় ৯।১০ মাস কাল উষ্ণতা অনুভূত হয়, এখানে বারংবার ভোজন কিরূপে হিতকর হইবে? আয়ুর্ব্বেদ বলেন যে, শিশু ও বালক গণের পক্ষে ও মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে বারংবার ভোজন হিতকর।

আমাদের দেশে শীতকালে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে গুরুপাক দ্রব্য সকল সেই সময়েই উৎপন্ন হয়। যথা, নূতন চাউল, কপি, পিষ্টক, পুলি, প্রভৃতি। গুরুপাক দ্রব্য এই সময়ই আমাদের দেশে খাইবারও ব্যবস্থা আছে।

খাদ্যকালে ঈষদুষ্ণ খাদ্য খাওয়া উচিত। ঈষদুষ্ণ খাদ্য পাকস্থলী গত হইয়া শীঘ্রই অগ্নিকে উদ্দীপিত করে, এজন্য উহা শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। অথচ খাদ্য ঈষদুষ্ণ হইলে খাইতেও ভাল লাগে, দ্রব্যও রসনার তৃপ্তি সাধক হয়।

স্নিগ্ধ ভোজ্য আহার করা উচিত। স্নিগ্ধ দ্রব্য শরীরের পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক। ইহা শীঘ্র জীর্ণ হয়। স্নেহ বিশিষ্ট দ্রব্য এবং তৈল ঘৃতাদি সম্পর্ক বিশিষ্ট ভোগ্যকে স্নিগ্ধ বলা যায়।

দেশী চাউল স্বভাবতই স্নিগ্ধ এবং বালাম চাউল রুক্ষ, মৎস্যাদি স্নিগ্ধ, আবার রুক্ষ। দ্রব্যকে স্নেহাদিযুক্ত করিলে উহাকে স্নিগ্ধ বলা যায়, যথা—ঘৃতাদি পক্বব্যঞ্জন। মাষকলাই স্বভাবতই স্নিগ্ধ,এজন্য উহাতে ঘৃতের প্রয়োজন হয় না। অরহর, মুগ প্রভৃতি রুক্ষ, এজন্য উহাদিগকে পরিমিত ঘৃতাদির সহ পাক করিলে শীঘ্র পরিপাক হয়।

খাদ্যকালে আহারের মাত্রা বিষয়ে বিশেষ পর্য্যালোচনা করা উচিত, কারণ খাদ্যেরই মাত্রাধিক্য ও কাল বিপর্য্যয়ই অগ্নিমান্দ্যের অন্যতম প্রধান কারণ রূপে পরিগণিত হয়। আহারের মাত্রার নিয়ম পরিমাণের দ্বারা নির্দ্দেশ হয় না, কারণ প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতির বিভিন্নতা বশতঃ একই পরিমাণের খাদ্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের শরীরে পৃথক

পৃথক ফল দান করে। যেরূপ আহার করিলে, উদরের গুরুতা বশতঃ বসিতে উঠিতে বা চলিতে ক্লেশ অনুভব হয় না, ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, নির্দ্দিষ্ট সময়েই অর্থাৎ বৈকালের মধ্যেই সম্যক জীর্ণ হয়, দাস্ত পরিষ্কার হয়, নিত্য শরীরের পুষ্টি সঞ্চিত হয়, তাহাই আহার করা উচিত। খাদ্যকালে পূর্ব্ব খাদ্য জীর্ণ হইয়াছে কি না লক্ষ্য করিতে হয়। যদি পূর্ব্ব খাদ্য পরিপাক না হইয়া থাকে, তাহার উপর পুনরায় খাদ্য খাইলে, পূর্ব্ব ভুক্ত খাদ্যের সহ নূতন খাদ্য মিশ্রিত হইয়া আরও দুষ্পাচ্য হইয়া পড়ে এবং অজীর্ণ জন্য নানা রোগ জন্মায়। এজন্য খাদ্য কালে দেখিতে হয় যে, উদ্গারের সহ পূর্ব্ব ভুক্ত খাদ্যের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে কিনা? বেশ ক্ষুধা হইয়াছে কি না? মল মূত্রাদি নিঃসারিত হইয়া শরীর বেশ হাল্কা হইতেছে কি না?

বিরুদ্ধ বীর্য্য দ্রব্য একত্র ভোজনই নানা রোগের হেতু।

মৎস্য ও দুগ্ধ একত্র করিয়া আহার করিলে নানা রোগ—এমন কি কুষ্ঠ রোগও হয়। আমরা যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য দেখিতে পাই—সে সমস্ত দুইভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। কতকগুলি শীতবীর্য্য ও কতকগুলি উষ্ণ বীর্য্য। সাধারণতঃ শীতবীর্য্য বিশিষ্ট দ্রব্য সকল শরীরের পুষ্টি সাধক, মল মূত্রাদি পরিষ্কারক, বল বর্দ্ধক এবং গুরুপাক অর্থাৎ পরিপাক হইতে কিছু অধিক সময় লাগে। ইহা অজীর্ণ ও জ্বরাদি রোগগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রায়শঃ হিতকর নহে; যথা কদলী, আতা, পেয়ারা, পেঁপে, নূতন চাউল, কচ্ছপ প্রভৃতি জল জন্তুর মাংস, দুগ্ধ।

উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্য সকল শীঘ্র পরিপাক হয় এবং মল মূত্রাদির কথঞ্চিৎ অবরোধ জন্মায়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও শরীরের লঘুতা সম্পাদক। যথা লশুন, মাষকলাই, তিল, বেগুণ, তেঁতুল, লবণ, আমড়া, মৎস্য প্রভৃতি।

মৎস্য উষ্ণবীর্য্য এবং দুগ্ধ শীতবীর্য্য। এজন্য মৎস্য ও দুগ্ধ একত্র ভোজন নিষিদ্ধ। কিন্তু দধি উষ্ণবীর্য্য বলিয়া আমাদের দেশে দধি ও মৎস্য একত্র খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

যেখানে ঘৃণা উপস্থিত হয় অথবা অন্য কোন প্রকারে খাদ্যকালে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে—এরূপ স্থানে আহার করা উচিত নহে। যেরূপ তাড়াতাড়ি খাওয়া বিধি বিরুদ্ধ, সেইরূপ অত্যন্ত আস্তে আস্তে খাওয়াও ঠিক নহে। অত্যন্ত আস্তে আস্তে খাইলে অধিক খাওয়া হয় এবং খাদ্য জুড়াইয়া যায়, তজ্জন্য খাদ্য জীর্ণ হইতে অত্যন্ত সময় লাগে, কখনও বা অজীর্ণ হয়।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খাইলে খাদ্য সকল উপযুক্তরূপ চর্ব্বিত হয় না, খাদ্যগুলি উপর দিকে উঠিতে থাকে। শরীরের অবসন্নতা হয়, এবং রীতিমত ভাবে পাকস্থলীতে গমন করেনা। অপিচ খাদ্যের দোষগুণ সকল সময় উপলব্ধি হয় না। খাদ্যকালে হাস্য করা বা গল্প করা উচিত নহে। খাদ্য কালে হাস্য বা গল্প করিলে খাদ্যগুলি রীতিমত ভাবে পাকস্থলী গত হয় না, যেন উপরে উঠিতে থাকে। গল্পে বা হাস্যে চিত্ত রত থাকার দরুণ অনেক সময় যদি খাদ্য কোন প্রকারে দূষিত হয়, তাহা অনুভব করা যায় না। এজন্য পরিণামদর্শী ব্যক্তিগণ খাদ্যকালে হাস্য বা গল্পে বিরত হয়েন।

যদি খাদ্যকালে ভোজন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করা হয়,তাহা হইলে কোন্ খাদ্য স্বীয় শরীরের উপযোগী এবং কোন্ খাদ্য অনুপযোগী তাহা বুঝিতে পারা যায়।

যদিও পাশ্চাত্য-রীতি খাদ্যকালে গল্প করা, কিন্তু তাহাতে অন্নাদি হৃদয়ের কোন অংশে প্রবেশ করিলে বিষম ভাবে অবস্থিত করিতে দেখা যায়, ইহাকে চলিত ভাষায় 'বেশম' খাওয়া বলে। ইহা কখনও কখনও জীবন নাশকও হইতে দেখা গিয়াছে। ভোজনান্তে মুখাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক তাম্বুল চর্ব্বন কর্ত্তব্য। পরিমিত তাম্বুল সেবন রুচিকর, মুখের দৌর্গন্ধ নাশক, অগ্নির উদ্দীপক।

কিন্তু অধিক তাম্বুল চর্ব্বন করিলে অগ্নি মান্দ্য ও দন্তসম্বন্ধীয় পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

ভোজনের পর শতপদ গমনান্তর সুখোপবেশন কর্ত্তব্য। ভোজনের অব্যবহিত পরেই উপবেশন বা শয়ন করিলে অন্ন সকল কোষ্ঠে সম্যক রূপে নীত না হইয়া একত্র অবস্থিতি করে এবং জীর্ণ হইতে বিলম্ব হয়।

দিবানিদ্রা কফ বর্দ্ধক, অজীর্ণকর ও শরীরের জড়তা সম্পাদক। দিবাভাগে শরীরের প্রত্যেক হৃদয় সম্যক বিকশিত হয়, আবার উহা রাত্রে সঙ্কুচিত হয়।

নিদ্রাতে শরীরের জড়তা আসে এবং জড়তা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে স্তব্ধ করিয়া রাখে, এজন্য দিবা নিদ্রাতে শরীরের যন্ত্র ও তাবৎ ইন্দ্রিয় সকল অলস ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

আহারের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

সূর্য্যাস্তের তিন চারি ঘণ্টা পরে রাত্রিকালীন ভোজন করা কর্ত্তব্য। রাত্রি ভোজনের পর আধঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া শয়ন করা কর্ত্তব্য। রাত্রি ভোজনের পর অধিককাল জাগরণ করিলে ভুক্ত খাদ্য সুজীর্ণ হয় না।

---

# বায়ুপিত্ত কফ।*

( কবিরাজ শ্রীশরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ )

—:*:—

যখন সমস্ত চিকিৎসা-জগত গাঢ় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষীণতম রশ্মিও পৃথিবীর কোন প্রদেশে পতিত হয় নাই, তখন এই বৃদ্ধ আয়ুর্ব্বেদই রোগ তাপদগ্ধ দেশবাসীর ভীষণ রোগযন্ত্রণা নিবারণ করিয়াছিল, এই আয়ুর্ব্বেদই যে সমস্ত আয়ুর্বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি, এ কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি, আমরা বর্ত্তমানে যে সমস্ত চিকিৎসাবিজ্ঞান দেখিতে পাই, তাহারা কেহই আয়ুর্ব্বেদের মূল তত্ত্ব উল্লঙ্ঘন করিতে পারে নাই—এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই

* কলিকাতা "আয়ুর্ব্বেদ সভা"য় পঠিত।

স্বীকার করিবেন। আয়ুর্ব্বেদ—অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত, অতএব ইহা যে নিত্যসত্য—তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, এই আয়ুর্ব্বেদ যে দেশে কবে প্রচারিত হইয়াছিল—তাহা কেহই বলিতে পারে না, তবে ইহা যে অতি প্রাচীন, তাহা সুনিশ্চিত।

অনাদি প্রবহমান নিত্য সত্য এই আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তি বায়ু পিত্ত ও কফ—এই দ্রব্যত্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই বায়ুপিত্ত কফের স্থান-গুণ কর্ম্ম প্রকোপ-প্রশমন তত্ত্ব লইয়াই আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব বা স্বরূপত্ব।

সত্বরজঃতম—এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া যেমন জগতে কোন পদার্থের অবস্থিতি নাই; তেমন বায়ুপিত্ত ও কফ ব্যতিরিক্ত আয়ুর্ব্বেদ মতে কোন রোগেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। এই বিশাল জগতে যত প্রকার রোগ দেখা যাইতেছে বা দেখা যাইবে, তৎসমস্তই বায়ুপিত্ত কফের প্রকোপসম্ভূত। তাই সুশ্রুত সূত্রস্থানে "আতুরোপক্রমণীয়" অধ্যায়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"নাস্তিরোগো বিনা দোষৈ র্যস্মাৎ তস্মাদ্ বিচক্ষণঃ। "অনুক্তমপি দোষানাং লিঙ্গৈ র্ব্যাধিমুপাচরেৎ"।

ভবিষ্যদ্ ব্যাধিও যে বায়ুপিত্ত কফের ভিত্তি লঙ্ঘন করিবে না, সুশ্রুত তাহারও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে বিস্মৃত হন নাই। আধুনিক জীবাণু বাদী চিকিৎসকগণ রোগ ভেদে জীবাণু ভেদ কল্পনা করিয়া অনন্ত জীবাণু রোগের মুখ্য কারণ বলিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ঈক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মতে ম্যালেরিয়া জ্বর, কালা জ্বর প্রভৃতি রোগের পরীক্ষা করিলে বিভিন্ন মূর্ত্তি জীবাণু দেখা যায়, টাইফয়েড্ রোগীর ও কলেরা রোগীর পুরীষ এবং যক্ষা ও হাঁপানী প্রভৃতি রোগীর কফ পরীক্ষা করিলে বিবিধ প্রকার জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত সমস্ত প্রচলিত রোগের ও জীবাণু আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই।

অপরিসমাপ্ত কার্য্যের সমীচীনতা হিন্দু শাস্ত্রের বহির্ভূত, জীবাণুবাদের আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে; তথাপি কারণতা সাধর্ম্ম্যে জীবাণুবাদ সম্বন্ধে সঙ্ক্ষেপে কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম, ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের মতে আপ্ত বচন ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না, যে কোন দিন 'চন্দ্র' সম্বন্ধে উপদেশ পায় নাই, সে সহস্রবার চন্দ্র দর্শন করিলেও চন্দ্র প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। "ভ্রম প্রমাদ রাহিত্যং আপ্তত্বং" ইহাই আপ্ত শব্দের দার্শনিক লক্ষণ, জীবাণুবাদী বৈজ্ঞানিক গণ যে পর্য্যন্ত সমস্ত রোগের জীবাণু দর্শন করিতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত—এ কথা বলা যায় না। তারপর জীবাণুবাদী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, দূষিত বাষ্পাদি হইতে এক প্রকার বিষ-মশক শরীরে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই বিষাক্ত মশক যদি মানব শরীরে দংশন করে—তাহা হইলে মানবের রক্তে সেই বিষ সংক্রামিত হইয়া ম্যালেরিয়া জ্বর জন্মাইয়া থাকে, এ তথ্য শুনিলে আমাদের মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হয়, কারণ যে মশক মনুষ্য শরীরে ম্যালেরিয়া বিষ বপন করে, সে মশক কি মনুষ্য হইতে ক্ষীণতর প্রাণীদিগকে দংশন করে না? কিন্তু ইন্দুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবের ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা যায় না। তবে যদি মানব-রক্তে কোন বিশিষ্ট শক্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই শক্তি কি? ইহার উত্তর কি জীবাণু

বাদীর আছে? আয়ুর্ব্বেদেও জীবাণু তত্ত্ব আছে —যদি কেহ একথা প্রচার করিতে চাহেন; তদুত্তরে আমরা বলিব—পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান জীবাণুকে সাক্ষাৎ রোগজনক বলিয়া যে ভাবে ঘোষণা করিতেছে, আয়ুর্ব্বেদ—বায়ুপিত্ত কফ ভিন্ন অন্য কাহাকেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রোগ জনক বলিয়া কোথায়ও সেভাবে নির্দ্দেশ করে নাই, বস্তুতঃ যদি আয়ুর্ব্বেদ আধুনিক জীবাণুবাদী হইত, তাহা হইলে নবীন জীবাণুবাদীর জীবাণু ধ্বংসের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদেও জীবাণুর সমুলোচ্ছেদের উপায় বিহিত থাকিত। আয়ুর্ব্বেদ কিন্তু স্বপনেও বায়ুপিত্ত কফ ভিন্ন অন্য কাহারও চিকিৎসার উল্লেখ করে নাই। আয়ুর্ব্বেদেও জীবাণুবাদ আছে—ইহা স্বীকার করিয়া আয়ুর্ব্বেদের গৌরব বৃদ্ধি করিতে কেহ কেহ কুষ্ঠৈককর্ম্মা রক্তজ ক্রিমির প্রমাণ উল্লেখ করেন, আমরা কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সে তত্ত্বে একমত হইতে পারি নাই, কারণ রক্তজ ক্রিমি জনিত কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাদৃশ কোন বিবরণ দেখিতে পাই না, তবে সুশ্রুতের কুষ্ঠ নিদানে দেখিতে পাই যে, পিত্তজ কুষ্ঠরোগে ক্রিমি উৎপন্ন হয়। আবার দেখি, মেদ আশ্রিত কুষ্ঠে ক্রিমির সম্ভব হয়, অথচ রক্তজ ক্রিমি জনিত কুষ্ঠের কোন পৃথক লক্ষণ দেখিতে পাই না, অতএব আমাদের মনে হয়, দোষ-বিকৃতিই রক্তজ ক্রিমির কারণ, কুষ্ঠজনক দোষ স্বকারণে কুপিত হইয়া দুষ্য সমূহ আশ্রয় করতঃ যথা কুষ্ঠ রোগ উৎপাদন করে, তথা রক্তেও ক্রিমি জন্মাইয়া থাকে, যেমন ত্রিদোষজনিত হৃদ্ রোগে তিল-গুড় ক্ষীরাদি সেবিত হইলে ক্রিমিজ হৃদরোগ জন্মিয়া থাকে, তথাচ চরক বলিয়াছেন—"ত্রিদোষজেতু হৃদ্ রোগে যো দুরাত্মা নিষেবতে! তিলক্ষীর গুড়াদীংশ্চ গ্রন্থিস্তস্তোপ জায়তে॥ মর্ম্মৈক দেশে সংক্লেদো রসশ্চাপ্যুপ গচ্ছতি। সংক্লেদাৎ ক্রিময়শ্চাস্য ভবন্ত্যপ হতাত্মনঃ। রক্ত ক্রিমিজ কুষ্ঠ রোগ ও তেমনি দোষ বিকৃতি জন্ত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কুষ্ঠ রোগের ন্যায় ক্রিমিজ হৃদ্‌রোগ সংক্রামক বলিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কেহই স্বীকার করে নাই। অতএব সংক্রামক ব্যাধি সমূহের সংক্রমন উপায় যে জীবাণু—একথা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। যাহাহউক আয়ুর্ব্বেদ যখন বায়ুপিত্ত কফকে রোগের মুল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং তাহাদেরই উপশম বা সামান্য উপায়কে চিকিৎসা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, তখন আমরা সেই বায়ুপিত্ত কফকেই রোগের মুখ্য কারণ বলিব, এবং জীবাণু প্রভৃতি অন্যান্য কারণ কুটকে দোষপ্রকোপ কারণ বলিয়া স্বীকার করিব।

আয়ুর্ব্বেদ মতে বিকৃত দোষই সমস্ত রোগের অব্যভিচারী কারণ;—তাই বাগভট বলিয়াছেন, "বিকারো দোষ বৈষম্যং"। বিকৃত বায়ু পিত্তকফকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দোষ বলে। কারণ দোষ শব্দের অন্বর্থ যথা—"শরীরং দূষয়-তীতি দোষঃ"। অর্থাৎ শরীরকে যে দূষিত করে তাহাকে দোষ কহে, আবার দূষিত বায়ুপিত্ত কফকে "মল"ও বলে, যে হেতুক দুষিত বা বিকৃত বায়ুপিত্ত কফ দেহের মলিনতা উৎপাদন করে, কিন্তু অবিকৃত বায়ুপিত্ত কফ "ধাতু" নামে অভিহিত হয়, কারণ তখন উহারা দেহকে রক্ষা করে, তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "শরীর ধারণাদ্ধাতবঃ" রসরক্তাদি ধাতু

ও বাত পিত্ত কফ শরীরকে ধারণ করে বলিয়া ধাতু নামে অভিহিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রোগ তত্ত্ব ও চিকিৎসাদি বর্ণিতস্থানে বায়ুপিত্ত কফকে সর্ব্বত্রই "দোষ ও মল নামে অভিহিত করিয়াছে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রাণ স্বরূপ বায়ুপিত্ত কফের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্মতম ও যোগজ জ্ঞান গম্য, তদ্বিষয়ে আমার ন্যায় নগণ্য ক্ষুদ্র মানবের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই ধৃষ্টতা মাত্র; তথাপি গুরু পরমনরায় ও সামান্য জ্ঞানদ্বারা শাস্ত্রার্থ যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বিবৃত করিব।

## বায়ু।

বায়ুপিত্ত কফ ত্রয়ের মধ্যে বায়ুই প্রধান; বায়ু ভিন্ন দৃশ্যমান জাগতিক কোন ক্রিয়াই যেমন সম্পন্ন হয় না, তেমনি শারীরিক কোন কার্য্যই বায়ু ব্যতিরেকে নিষ্প হইতে পারে না, তাই ভগবান্ ধন্বন্তরি বলিয়াছেন— স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্ বায়ুরিত্যভিশালিতঃ॥ ইত্যাদি। এই বায়ুর মৌলিকতা অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারি যে, পঞ্চভূতান্তর্গত বায়ু আর এই শারীর বায়ু একই পদার্থ, তবে সূক্ষ্ম ও স্থুল ভেদ বায়ু দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে; —যথা পরমাণুরূপ বায়ু ও পরমাণু সমূহ রূপ বায়ু, পরমাণুরূপ বায়ু সূক্ষ্ম বায়ু এবং পরমাণু সমূহরূপ বায়ু স্থূল বায়ু, ইহাই বৈশেষিক দর্শনের কথা। উক্ত সূক্ষ্ম বায়ু নিত্য এবং পরমাণু সমূহরূপ স্থূল বায়ু অনিত্য, এইপ্রকার ক্ষিতি-অপ্‌-তেজঃ-ব্যোমকেও বায়ুর ন্যায় স্থূলও সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত করিয়াছে। সুতরাং আমাদের স্থূল দেহের আরম্ভক পঞ্চ মহাভূত ও পরমাণু সমূহরূপ স্থূল, অতএব বায়ুও যে স্থূলবায়ু তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সোমগুণ দ্বারা চন্দ্র, শোষণ গুণ দ্বারা সূর্য্য এবং বিক্ষেপন দ্বারা বায়ু যেমন জগৎ ধারণ করিয়া আছে, তেমনি কফ আমাদের দেহে সৌম্যগুণ দান, পিত্ত প্রবৃদ্ধ জলীয় ধাতু শোষন এবং বায়ু শরীরের অনুপযোগী মলাদি পদার্থে বহির্গমন দ্বারা দেহকে রক্ষা করিতেছে, তাই সুশ্রুত বলিয়াছেন "বিসর্গাদান বিক্ষেপৈঃ সোম সূর্য্যানিলা যথা, ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফ পিত্তানিলা তথা"। চন্দ্রসূর্য্যের বিসর্গ ও আদান কার্য্যের প্রবর্ত্তক বায়ু, কারণ রজোগুণই সমস্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক, যথাহ সুশ্রুতঃ "সহি রজোভূয়িষ্ঠঃ রজশ্চ প্রবর্ত্তকং সর্ব্বভাবানাং"। অর্থাৎ সেই বায়ু রজোগুণ বহুল, কারণ রজোগুণই সমস্ত দ্রব্যের চালক, সেই রজোগুণ ভূয়িষ্ঠ বায়ুই যে আমাদের রোগারম্ভক বায়ু তাহাতে আর সন্দেহ নাই, আয়ুর্ব্বেদ মতে যত প্রকার রোগ আছে তাহাদের উৎপত্তির প্রতি বায়ুরই প্রধান কর্ত্তৃত্ব; পিত্ত-কফ সহস্র দুষিত হইলে ও বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া আমাশয়াদি স্থানে আশ্রয় না করিলে কোন রোগেরই উৎপত্তি হইতে পারে না, তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবোমল ধাতবো, বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ"॥

আবার চরক বলিয়াছেন "যোগবাহঃ পরং বায়ুঃ সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ। তেজঃ কৃত পিত্তসংযুক্তঃ শীত কৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ"॥ অর্থাৎ বায়ু যোগবাহী, যখন পিত্ত সংসর্গে থাকে তখন পিত্তের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং যখন কফের সহিত সংযুক্ত থাকে তখন কফের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিয়া থাকে। চরকোক্ত এই শ্লোক দ্বারা আমরা বুঝিতে

পারি যে, বল ও কফজ ব্যাধি মাত্রেই বায়ুর সংসর্গ থাকে। তাই বলিয়া সর্ব্বত্র দ্বন্দ্বজ ব্যাধির আশঙ্কা, করিবার কারণ নাই। দ্বন্দ্বজ ব্যাধির চিকিৎসায় দোষদ্বয়েরই চিকিৎসা হইয়া থাকে, কিন্তু এস্থলে পিত্তকফের চিকিৎসা করিলেই বায়ু স্বয়ং প্রশমিত হয়, সুতরাং সেস্থলে বায়ুর রোগ জনকত্ব স্বীকার না করিয়া দোষ চালকত্ব স্বীকার করাই যথেষ্ট মনে হয়।

ক্রমশঃ

# বসন্ত রোগে নিম্বের প্রভাব।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিরত্ন।

মাধবীর মনে স্থান না পাইলেও গুড়ুচীর রুচি চিরদিনই সমান চিরকালই গুড়ুচীরাণী তাহার হৃদয় রাজাকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ রাখিয়া পতিব্রত্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে—শত্রু সংহারে স্বামীর সহায়তা করিয়া সহধর্ম্মিনীর গুরু গৌরব রক্ষা করে, এহেন গুড়ুচীবল্লভ নিম্ব বৃক্ষই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য, নবাভিনয়ের ধীরোদা নায়ক। এমন একটী পরম তিক্তপদার্থের পর্য্যালোচনা অদ্যকার সুধী শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করিতে পারিবে না ইহা আমি জানিয়াও কেবল গাছটীর গুণের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়াই আজ তাহাকে এখানে উপস্থিত করিয়া ফেলিয়াছি!

এই অসাধারণ শক্তিশালী বৃক্ষ কতকগুলি রোগের উপর স্বতন্ত্রভাবে এবং কতকগুলি রোগের উপর পরতন্ত্রতঃ আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, ইহা একাই যাহাদিগকে শাসন করে, একমাত্র এই নিম্ববৃক্ষেরই শক্তি যেসকল রোগকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া দেয় সে সকল রোগকে আমি পৃথক করিয়া ক্রমশঃ আলোচনার ইচ্ছা করিয়াছি আজ কেবল কলিকাতার কৃতান্ততুল্য বসন্ত রোগকে নিম্ব কতখানি আয়ত্তে রাখিতে পারে তাহাই দেখাইতেছি।

আলোচ্য বসন্ত রোগের আয়ুর্ব্বেদীয় নাম মসূরিকা, মসূরীর ডালের মত চ্যাপ্‌টা অথচ গোলাকৃতি এবং দেখিতে প্রায় সেই পরিমাণ বলিয়াই ইহার মসূরিকা নামকরণ হইয়াছে। অন্যদিকে বসন্ত ঋতুতেই তাহার প্রকোপ অধিক বলিয়া ব্যবহারিক বাঙ্গালা ভাষায় তাহাকে বসন্ত রোগে অভিহিত করা হয়। আয়ুর্ব্বেদমতে উৎপাদক কারণ বর্ত্তমান থাকিলে উহা যে কোন ঋতুতেই হইতে পারে, বাস্তবিক আমরা শরৎ গ্রীষ্ম ঋতুতেও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইতেছি তবে বসন্ত ঋতুতে যে ইহার প্রকোপ অত্যধিক এ কথা অবিসংবাদিত সত্য সুতরাং আমিও আজ মসূরিকাকে বসন্ত রোগ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি।

বসন্ত রোগের উৎপাদক কারণগুলি সাধারণতঃ দুইশ্রেণীতে বিভক্ত, কতকগুলি রোগিগত এবং কতকগুলি প্রকৃতগত। রোগিগত কারণগুলি রোগীর আহার বৈষম্য জাত আর প্রকৃতিগত কারণগুলি জলবায়ুর বৈগুণ্য বশতঃ প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের দ্বারা ঘটিয়া থাকে, সাধারণতঃ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন না হইলে কেবল খাদ্য বৈষম্যে এই রোগের উৎপত্তি দেখা যায় না। আয়ুর্ব্বেদেও "প্রদুষ্ট পবনোদকৈঃ" বলিয়া বায়ু ও জলের পরিবর্ত্তনকে বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সুতরাং প্রকৃতি বৈষম্যই বসন্ত রোগোৎপত্তির প্রকৃত কাল ইহা একরূপ বলা যাইতে পারে, বায়ু ও জলের পরিবর্ত্তনের হেতু নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া আয়ুর্ব্বেদের টীকাকার বলিতেছেন "বিষকুসুমাদি সংস্পর্শাৎ প্রদুষ্টঃ পবনঃ তথা উদকঞ্চ তৈঃ"। অর্থাৎ সেই সময়ে এমন কোন বিষাক্ত পুষ্পাদি প্রস্ফুটিত হয় যাহার সংস্পর্শে বায়ু এবং বায়ু প্রবাহের ফলে জল দূষিত হইয়া প্রকৃতিতে রোগপ্রবণ পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়, বাস্তবিক যাহার গুণাগুণ জানা নাই এমন কুসুমগুচ্ছ হাতে করিয়া অনেক সময় আমরা হস্তকণ্ডূয়ণে বিব্রত হইয়া থাকি, রূপের মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া সুবাসের আশায় অনেক ফুলকেই আদরে আমরা নাসিকার নিকট ধরিয়া বমনবেগ ও শিরোঘূর্ণনে প্রতারিত হইয়াছি। ঋতুবিশেষে সেসকল ফুল ফোটে এবং তাহারাই পূর্ব্বোক্ত বিষকুসুমের অন্তর্গত। সুশ্রুত সংহিতার কল্পস্থানে করব মহাকরব্ব বল্লীজ প্রভৃতি বিষ পুষ্পের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তাহাদের গন্ধগ্রহণে "জিঘ্রতশ্চ শিরো-দুঃখং বারিপূর্ণেচ লোচনে" এই বলিয়া বিষম অনিষ্টের উল্লেখ সুশ্রুত করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে বসন্তরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর, গাত্র বেদনা, অস্থির চিত্ততা, ত্বকের বিবর্ণতা ও ঈষৎ স্ফীতি কখনো বা কণ্ডূয়ণ এবং নেত্রদ্বয়ের রক্তবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ গুলি সাধারণতঃ দেখা যায়। এখন আমরা নিম্বের সাধারণ গুণ কি এবং এই রোগের উপর কতখানি প্রভাব বিচার করিয়া দেখি, আয়ুর্ব্বেদে নিম্বকে নিম্ব মহানিম্ব ও কৈডর্য্য ভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। নিম্ব বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত বৃক্ষ, গ্রামে গ্রামে অযত্ন সম্ভূত ও স্বয়ং বর্দ্ধিত হইয়া মানবমণ্ডলীর অশেষ উপকার করিবার জন্য যেন ঋতু বিশেষে পত্র পুষ্প ফল লইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার নিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে মহানিম্ব অর্থাৎ ঘোড়া নিম বলে, কৈডর্য্য নিম্ব এই ঘোড়া নিমের প্রকার ভেদ মাত্র। মহানিম্বের পত্র নিম্বের পত্র অপেক্ষা অপেক্ষা একটু ছোট, অনেকটা নিমের পত্রাবলীর অগ্রভাগে যে পাতাটী থাকে তাহারই মত, আলোচ্য বিষয় পূর্ব্বোক্ত বৃহৎপত্র নিম্বকে লইয়াই সুতরাং ঘোড়া নিম্বের বিশেষ বর্ণন অনভিপ্রেত।

নিম্বের স্বাদ তিক্ত কিন্তু তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া কটু অর্থাৎ ঝাল রসে পরিণত হয় এবং ইহা আভ্যন্তরীণ শীতল ক্রিয়া সম্পাদক ইহার পত্র, পুষ্প, ফল, কাণ্ডত্বক ও মূলত্বক ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ভাব—প্রকাশের মতে বাতনাশক, শ্রম নাশক ও জ্বর নিবারক, সুশ্রুতের মতে দাহ জ্বর নাশক,

রাজ নিঘণ্টু ও ধম্বন্তরীয়নিঘণ্টু গ্রন্থকার দ্বয়ের মতে শোথ নাশক এবং কণ্ডু প্রভৃতি পিত্তজনিত বিবিধ বিকৃতি নাশক, ইহার রস বীর্য্যের শক্তি পিত্ত ও কফ নাশ করিলেও রাজবল্লভ ও ভাব প্রকাশ ইহাকে "বাত-কুষ্ঠঘ্নৎ" অগ্নিবাতঘ্নৎ" প্রভৃতি বাক্যে বাতপ্রশমক বলায় ইহার প্রভাব শক্তি বাত নাশ করে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক বসন্ত রোগের সূচনায় জ্বর গাত্র-বেদনা প্রভৃতি যেকয়টী লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সে সকলকে নিম্বের স্বাধীন শক্তি নাশ করে ইহা উপরি উদ্ধৃত গ্রন্থ সকলের অভিমত লইয়া অসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

নিম্ব বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্পাদক, দূষিত ও বিষাক্ত বায়ুকে সংশোধন করিতে ইহার শক্তি অপরিসীম, গ্রন্থকার হারীত কেবল ইহার ফলকে বিষক্রিয়া প্রশমক বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন কিন্তু ভাবমিশ্র "নিম্বপত্রং পরং নেত্র্যং ক্রিমিপিত্ত বিষপ্রণুৎ" এই বাক্য দ্বারা ইহার পত্রে প্রভূত বিষনাশক শক্তি রহিয়াছে বলিতেছেন। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ দাহজনক জ্বর, বিসর্প, বিস্ফোট প্রভৃতিতে পত্রযুক্ত নিমের ডালের বাতাস দেওয়ার এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি দুঃসাধ্য ব্রণ রোগীকে নিমের ছায়ায় উপবেশন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে বসন্ত রোগোৎপাদক দুষ্ট বায়ুকে বিশুদ্ধ করিবে তাহাতে বিচিত্র কি?

বসন্ত রোগ অধিকাংশ স্থলে ৩য় দিন হইতে প্রকাশ পাইয়া ৫ম হইতে ৭ম দিনের মধ্যে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, তৎপর ১ম সপ্তাহের শেষ হইতে ৮ম ৯ম দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া পূয়-পুষ্ট হইতে দেখা যায়, উক্ত উভয় অবস্থায় নিম্বের প্রভাব সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের অভিমত দেখা যাইতেছে। ধম্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার বলেন—"অপক্বং শোধয়েৎ শোফং ব্রণং পক্ব বিশোধয়েৎ" ইহার তাৎপর্য্য এই—যেকোন ফোলাযুক্ত অপক্ব ব্রণকে নিম্ব পাকাইয়া দেয় এবং পক্বা-বস্থায় তাহাকে শোধিত অর্থাৎ ক্লেদাদি রহিত করিয়া শুষ্কাভিমুখ করিয়া থাকে, মহামতি বাগ্‌ভট চিকিৎসা স্থানে বলিতেছেন—"নিম্ব-পত্রাণি সংলিপ্য মধুনা ব্রণ শোধনং।" (চিঃ ৩৫ অঃ) অর্থাৎ মধুর সহিত নিম্বপত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে ক্ষতের পূয়াদি দূরীভূত হইয়া ক্ষত শোধিত হইয়া থাকে, আরও বলিতেছেন কাঞ্জিকেন চ সংলিপ্য পিচুমর্দ্দ-দলানিচ লেপনং শস্যতে তস্য ব্রণ পূয় প্রশান্তয়ে" (চিঃ ২৫ অঃ) এবার তিনি ধান্যাম্লে পেষিত নিম্ব পত্রের প্রলেপের কথা বলিতেছেন, খুব সম্ভব তাঁহার এই দ্বিতীয় উক্তি জ্বালাকর তীব্র যাতনা দায়ক ক্ষতে ব্যবহারের জন্যই কারণ ধান্যাম্লে ব্রণের রোপণ শক্তি মাক্ষিকের অপেক্ষা অনেক কম। ব্রণবিশারদ সুশ্রুত বসন্ত চিকিৎসায় কেবল এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে "মসূরিকায়াং কুষ্ঠঘ্ন লেপনাদি ক্রিয়াহিতা" অর্থাৎ কুষ্ঠনাশ প্রলেপ ও কষায়পানাদিই বসন্তরোগের শ্রেষ্ঠ ভেষজ, এই একটী কথায় নিম্বের প্রতি তাহার কতখানি ইঙ্গিত তাহা কুষ্ঠ চিকিৎসায় নিম্বের প্রয়োগবাহুল্য পাঠ করিয়া চিকিৎসক মাত্রেই অবগত হইতে পারিয়াছেন। নিম্বের একটি নাম পিচুমর্দ্দ, পিচু শব্দের অর্থ কুষ্ঠ, তাহাকে মর্দ্দিত অর্থাৎ ধ্বংস করে বলিয়াই এই নাম, শার্ঙ্গধর বলেন "লেপান্নিম্বদলৈঃ কৃষ্ণঃ

ব্রণ শোধন রোপণঃ (মধ্যঃ খঃ ৫ম অঃ) ইহার মতে নিম্ব ব্রণের রোপণ ক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পন্ন করে।

এই সময়ের মধ্যে চক্ষুতে এবং মুখাভ্যন্তরে ও অনেকস্থলে বসন্ত গুটিকা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রভাবশালী নিম্বের আয়ুর্ব্বেদোক্ত শক্তি তাহাতেও ব্যাহত নয় ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি—রাজবল্লভোক্ত নিম্বের সাধারণ গুণ বর্ণনায় আছে বটে "নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং" কিন্তু বঙ্গসেন নেত্র রোগাধিকারেই সৈন্ধব ও শুঁঠের সহিত পেষিত নিম্বপত্র উষ্ণাবস্থায় বস্ত্র খণ্ডে জড়াইয়া পুলটিসের মত চক্ষুতে সেক দিলে নেত্রাভ্যন্তরোত্থিত ব্রণজনিত স্ফীতি ও ব্যথা নিবারিত হয় বলিয়া বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নিজেরই উক্তি—"শুণ্ঠী নিম্বদলৈঃ পিণ্ডঃ সুখোষ্ণঃ স্বল্পসৈন্ধবঃ ধার্য্যশ্চক্ষুষি সংক্ষেপাৎ শোথ কণ্ডুব্যথাপহঃ"। এই স্থানে শুণ্ঠী সৈন্ধবের উল্লেখ থাকিলেও উহা গৌণ, নিম্ব-ত্রই নেত্র রোগনাশনে মুখ্য-দ্রব্য। মহামতি বাগ্ভট দন্ত বেষ্টগত ও তালু-গত মুখ রোগে নিম্বমূল ত্বকের কাথে কবল ধারণের কথা বলিতেছেন, চিকিৎসা স্থানে তাঁহার নিজের উক্তি "কাথশ্চ নিম্বমূলস্য দন্তাদি ব্রণ ধারণঃ" এ স্থলে দন্ত ব্রণের উল্লেখ থাকিলে ও তালুকণ্ঠ গত ব্রণ নাশনেও নিম্ব-মূলের শক্তি অসীম বলিয়া অভিপ্রেত ইহা আদি শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে, বলা বাহুল্য যে আয়ুর্ব্বেদ মতে ত্বকের যাবতীয় উৎসেধ অর্থাৎ স্ফীতি এবং বিবিধ ক্ষত ব্রণশব্দবোধক সুতরাং মসূরিকাও ব্রণেরই অন্তর্ভুক্ত। সুশ্রুত ব্রণের নিরুক্তি বলিতেছেন। বৃণোতি আচ্ছাদয়তি স্বচমিতি ব্রণঃ। অতএব শাস্ত্র বাক্য পর্য্যালোচনা করিয়া বেশ প্রতীতি হইতেছে যে বসন্ত রোগের উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতে বসন্ত গুটিকার পাকাবস্থা পর্য্যন্ত রোগের সকল অবস্থাতেই সহজ লভ্য নিম্ব একটী প্রধান প্রশমক পরম শক্তিশালী ভেষজ। একমাত্র ইহার স্বতন্ত্র শক্তিতেই যে বসন্ত রোগ আরোগ্য হইতে পারে ইহা শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা একরূপ সমর্থিত হইল।

ইহার অনাগতপ্রতিষেধক শক্তি (Priventive power) বসন্তরোগ বিষয়ে কিরূপ অপরিমেয় তাহা পরে দেখাইব, সম্প্রতি বসন্তরোগের কোন্ অবস্থায় ইহা কিরূপভাবে প্রয়োগ করিয়া রোগ আরোগ্য করা গিয়াছে সংক্ষেপে তাহাই বলিতেছি। আয়ুর্ব্বেদে মসূরিকা চিকিৎসায় নিম্বকে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত প্রয়োগ করিবার কথা অধিক কিন্তু ইহাকে স্বতন্ত্র ভাবে প্রয়োগ করিয়া রস বীর্য্যের শক্তির অতীত যে ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে এ স্থলে সেই অচিন্তনীয় প্রভাবের কথাই বলা হইতেছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নিমের ছাল, পাতা, ফুল, ফল ও মূল অর্থাৎ মূলের ছাল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরিভাষায় "নিম্বাদীনাঞ্চ বল্কলম্" নিয়ম অনুসারে নিমের ছাল মাত্র গ্রহনীয় হইলেও রক্তশোধনাদি কার্য্যে নিম্বের পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী অঙ্গেরই ব্যবহারের বিশেষ বিধান আছে।

বসন্ত রোগে পঞ্চনিম্ববটীই প্রশস্ত (পত্র পুষ্পাদি প্রত্যেক সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করতঃ কুলের আঠির মত বটী করিয়া

রাখিতে হয় উহাই পঞ্চনিম্ব বটী,) রোগোৎপত্তির পূর্ব্বে পঞ্চনিম্ব বটী সেবনে রোগ কখনই মারাত্মক হইতে পারে না। অধিকন্তু বসন্ত-বিষ ভিতরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া জ্বর গাত্র বেদনা প্রভৃতি অচিরে দূরীভূত হয়। ২য় ৩য় অবস্থায় পঞ্চ নিম্বের কাথ পান অমোঘ ফলপ্রদ ইহাতে বসন্তের বিষ কমিয়া গিয়া দানা গুলি সংখ্যায় অল্প হয় অথচ খুব শীঘ্র বাহির হইয়া পড়ে এবং কাস কণ্ঠধ্বংস প্রভৃতি দারুণ উপসর্গ সকল উপস্থিত হইতে পারে না। এই অবস্থায় পঞ্চনিম্ব বটী তেমন ফল দায়ক নহে। শরীরের অংশবিশেষে দানা বহির্গত না হইলে এবং আভ্যন্তরীণ যন্ত্রণা হইলে পঞ্চ নিম্বের পাচন সেবনের সঙ্গে ঐ সকল স্থানে কাথ জলের সিঞ্চন পরম উপকারী, অথবা নিম্বপত্র মেথি কিম্বা আতপ তণ্ডুল ভিজান জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া এবং ঐ জলে গুলিয়া সেই জল সিক্ত বস্ত্র খণ্ডের দ্বারা পীড়িত স্থান বারংবার আবৃত করিয়া দিলে সত্বর বসন্তের গুটি বাহির হইয়া যায়, কিন্তু এইরূপ আর্দ্রবস্ত্র প্রয়োগ বক্ষঃস্থলে বিশেষ করা সঙ্গত নহে, তাহাতে শৈত্যাতিশয্য নিবন্ধন উৎকট কাস, জ্বরবেগ বৃদ্ধি, ফুস্ফুস্ প্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। চক্ষুতে ও মুখাভ্যন্তরে দানা উঠিলে পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থোক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিতে হয়, মলমূত্র ত্যাগের পর পঞ্চনিম্বের কাথে শৌচাদির ব্যবস্থা করিলে সেই সকল স্থানজাত পীড়কাগুলি পীড়া দায়ক হইতে পারে না। এই তৃতীয় অবস্থা পর্য্যন্ত আসিয়া অধিক সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়া উঠে, অল্প সংখ্যক রোগীই সাংঘাতিক ৪র্থ অবস্থায় গিয়া পড়ে।

বসন্ত রোগের চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ যখন বেশী পরিমাণে বহির্গত সমস্ত পক দানাগুলি গলিয়া এক হইয়া যায় সেই সময়টী বড়ই ভয়াবহ, কোন রোগী ঘোর বিকার কিম্বা তন্দ্রা গ্রস্ত থাকে, অথবা কোন রোগী অসহ্য যাতনায় ছটফট করে এবং কেবলই বাহ্যিক শীতলতার জন্য করুণ আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, পূর্ব্ব হইতেই পঞ্চনিম্বের কাথ রীতিমত সেবিত হইলে প্রায়ই বিকারাদি উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। রোগীর বাহ্যসন্তাপাদি দারুণ যাতনা উপস্থিত হইলে পেষিত নিম্বপত্র সদ্যঃ উদ্ধৃত নবনীতের সহিত আলোড়িত করিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইতে হয় এবং ডাল ছাড়া রাশি রাশি কাঁচা নিম্ব পত্র একত্র করিয়া অন্যূন অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত উঁচু করতঃ ঐ নিম্ব পত্রের শয্যায় রোগীকে শয়ন করাইয়া রাখিতে হয়, প্রত্যহ দুই বেলা পাতা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন করিয়া দিতে হইবে, এই ব্যবস্থা যে কিরূপ অমোঘ প্রশমক ও রোগীর আরাম দায়ক তাহা প্রত্যক্ষ না হইলে ভাষায় বুঝান যাইবে না। নিম্বপত্রে ঘৃত মাখাইয়া তাহা আগুনে পোড়াইয়া রোগীর গৃহে দিনে ৩।৪ বার ধুম করিতে হইবে, ঐরূপ নিম্বপত্রের শয্যায় শয়নের পর হইতে রোগীর শরীরের সমস্ত ক্লেদাদি পত্র সমূহে সংলগ্ন হইয়া যায় এবং ক্ষতে নূতন পূয়াদি সঞ্চিত হয় না, কাজেই দেহের দুর্গন্ধ ও ভয়াবহ স্ফীতি এই উপায়ে অচিরে দূরীভূত হইয়া যায়, এই সময়ে কাহারো কাহারো দেহের কোন কোন অংশের ক্ষত বেশ পরিষ্কার শুষ্কোন্মুখ এবং কোথাও বা পূয়যুক্ত ক্ষতের উপরে চামড়া আচ্ছাদিত দেখিতে পাওয়া যায়, এই অবস্থায়

যে অংশের ক্ষত অপেক্ষাকৃত শুষ্কোন্মুখ তথায় দাহ ও আকর্ষণবৎ বেদনা হয় এবং পূয়যুক্ত স্থানে ব্যথা ও ভার বোধ হয়, বিধাতার মূর্ত্তিমান আশীর্ব্বাদ মহোপকারী নিম্বের এই উভয় ক্ষেত্রেই আশ্চর্য্য প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, পূয়াদি রহিত ক্ষত নিম্বফলের তৈল কিম্বা নিম্বপত্র ভাজা ঘৃতের দ্বারা সিক্ত করিয়া রাখিলে রোগীর শরীরে টানের মত যাতনার শান্তি হয় এবং সত্বরই ক্ষত শুকাইয়া যায় আর ক্লেদযুক্ত চর্ম্মাচ্ছাদিত ক্ষতে শুষ্ক নিম্বপত্রের চূর্ণ উত্তমরূপে বস্ত্রে ছাঁকিয়া সেগুলি একটী সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে কিম্বা রেশমী বস্ত্রে বাঁটিয়া পুটুলী করতঃ তৎপর উহা আস্তে আস্তে টিপিয়া কিম্বা ঝাঁকিয়া তন্মধ্যস্থ নিম্ব পত্র চূর্ণ ক্ষতে প্রক্ষেপ করিলে খুব শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়, কেহ কেহ উপরি উক্ত নিম্বপত্র চূর্ণের সহিত সম পরিমাণ হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া থাকেন কিন্তু কেবল নিম্বপত্রের সূক্ষ্ম চূর্ণও পূয়যুক্ত বসন্ত শুষ্ক করিয়া থাকে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এইরূপে শুষ্ক হইয়া ক্রমে বসন্ত ক্ষতের শুষ্ক চর্ম্মগুলি সমস্তই স্বয়ং খসিয়া পড়ে, তখন সর্ব্বাঙ্গে পেষিত নিম্বপত্র মাখাইয়া নিম্বপত্র সিদ্ধ জলে রোগীর গাত্র ধুইয়া ফেলিতে হয়। তৎপর পক্ষ কাল পর্য্যন্ত নিম্ব ফলের তৈল কিম্বা নিম্বপত্র ভর্জ্জিত ঘৃত সর্ব্বাঙ্গে আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিলে বিগত-বসন্ত ব্যক্তির দেহ ক্রমে ক্রমে বৈবর্ণ্য বিযুক্ত হইয়া লাবণ্য যুক্ত হইয়া থাকে, এইরূপে বসন্ত রোগের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রে নিম্বের যে সকল প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

বিচারের চক্ষে দেখিতে গেলে বসন্ত রোগ বিকৃত বায়ুপিত্ত কফের একটী দুইটী কিম্বা সকলের সহিত মিশ্রিত দূষিত রক্ত জনিত চর্ম্মের বিকৃতি মাত্র, সুতরাং পিত্ত ও রক্ত দোষ নাশক এবং কিঞ্চিৎ কফাদি প্রশমক নিম্বের কার্য্যকারী শক্তি তাহার উপর সামান্য প্রভুত্ব করিতে পারে বটে, কিন্তু গুলঞ্চ চিরতা প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করিলে এবং বসন্ত রোগের উপর নিম্বের অনন্য সাধারণ প্রভাব প্রত্যক্ষ করিলে এই অযত্ন জাত উপেক্ষিত গ্রাম্য গাছটীকে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ বসন্ত চিকিৎসায় "নিম্বাদি কষায়" প্রভৃতিতে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ইহার প্রয়োগ প্রণালী বর্ণিত হওয়ায় প্রায়শঃ গৌণ ভাবেই ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। স্বতন্ত্রভাবে ইহার কার্য্যকারী শক্তি দেখাইবার জন্য আজ আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিলাম সম্প্রতি ইহার রোগ প্রতিষেধকতার সংক্ষিপ্ত কথা বলিয়া উপসংহার করিতেছি, পূর্ব্বেই বলিয়াছি দূষিত বায়ু বসন্ত রোগোৎপত্তির অন্যতম কারণ, নতুবা একই সময়ে বহুস্থান ব্যাপী রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না, বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্পাদন ও বায়ু প্রবাহ গত রোগ বিষনাশনে নিম্বের নাত্যল্প প্রভাব বাত-রক্ত, কুষ্ঠ রোগীর নিম্বচ্ছায়ায় অবস্থিতি ও বিসর্পাদিতে বৃদ্ধবৈদ্যের নিম্বপত্র ব্যজনে অঙ্গীকৃত হইয়াছে, বহুবার ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে নিম্বপত্র বহুল ক্ষুদ্র শাখা সমূহের দ্বারা গৃহের বা প্রকোষ্ঠের যত গুলি দ্বার ও গবাক্ষ আছে সবগুলির শীর্ষদেশ ঘন ভাবে সজ্জিত করিলে সেই গৃহে কিম্বা প্রকোষ্ঠে বসন্ত রোগের আবির্ভাব হয় নাই, বসন্ত রোগের সময় প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তি ৩টী নিম্বপত্র ও ১টী

গোলমরিচ জলে পিষিয়া উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন কিম্বা ১ দিন অন্তর সপ্তাহ কাল সেবন করিলে বসন্ত রোগ হয় না। ২।৩টী বড় নিম্ববৃক্ষ যে বাড়ীতে আছে সেই বাড়ীর নিত্য অধিবাসিদিগের কেহই বহু বর্ষ যাবৎ বসন্ত পীড়িত হয় নাই এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে বসন্ত উৎসবে নিম্ব পত্রের দ্বারা সমস্ত গৃহদ্বার সজ্জিত করা ও নিম্বপত্রের ধুম প্রদক্ষিণ করা প্রভৃতি কতকগুলি আবশ্যকরণীয় প্রথার প্রচলন আছে, অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছি এই রীতি বসন্ত রোগে প্রতিষেধক বলিয়াই অভিজ্ঞ প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া এখন গৃহস্থদিগের অবশ্য পালনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই সকল স্থানের এই প্রথা বেশ ফলবতী বলিয়াই মনে হয় কারণ, এতদঞ্চলের মত বসন্ত-রোগ-বিকৃত মানব-মুখমণ্ডল তথায় বড় একটা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এ হেন উপকারী বৃক্ষকে আমরা গ্রামান্তে বিদায় করিয়া দিয়াছি, যাহার সর্ব্বাঙ্গ মানব কল্যাণে ব্যয়িত হয়, মাধবীর প্রতি রোষেই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক যে নিম্ব বসন্তের চিরশত্রু, বসন্ত আসিবার পূর্ব্বে হইতেই যে পত্র পুষ্প লইয়া মরণের পথ হইতে মানুষকে টানিয়া আনিবার জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকে তাহাকে গৃহপার্শ্বে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইয়াই আজ আমরা এই রোগের করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছি না উপকারীর প্রতি উপেক্ষাতেই আজ আমাদের এই শোচনীয় পরিণাম বৎসর বৎসর এই কালব্যাধির কবলে কলিকাতার কত লোক যে অকালে কবলিত হইতেছে তাহা স্মরণ করিলেও হৃদকম্প উপস্থিত হয়। এই জন্য কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষকে আমি নিম্বের অনাগত প্রতিষেধক শক্তি (Priventive Power) পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি, নগরীর প্রশস্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে রোপিত ক্ষীণচ্ছায় বৃক্ষগুলির পরিবর্ত্তে তাঁহারা যদি সেই সেই স্থানে সুন্দর ছায়া বিতরণকারী নিম্ববৃক্ষ রোপণ করেন তাহা হইলে কালে বসন্ত রোগের তাণ্ডব লীলা সংযত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস, আপাততঃ তাঁহারা কোন একটী রাস্তায় কেবল নিম্ববৃক্ষ রোপণ করিয়া ৭।৮ বৎসর পরে সেই বসতিতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব পরীক্ষা করিতে পারেন, ইহাতে ক্ষতি মোটেই নাই কিন্তু লাভের আশা যথেষ্ট।

আজ এই পর্য্যন্ত বলিয়া এবং ১টি তিক্ত পদার্থের পর্য্যালোচনয়ে ধৈর্য্যশীল পাঠকবৃন্দকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বিরত হইলাম।*

---

* আয়ুর্ব্বেদ সভার বিগত অধিবেশনে পঠিত ও সমাদৃত, এতদ্ব্যতীত নিম্বপত্রের পাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জল পান ও নিমছালের রস পান বসন্ত প্রতিষেধক ও প্রশমক বলিয়া সভাস্থলে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। আঃ সং।

# ডেঙ্গু-জ্বর

( কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ )

—:•:—

বর্ত্তমানে কলিকাতা সহরে এবং তন্নিকট-বর্ত্তী পল্লীসমূহে ডেঙ্গুজ্বরের বিশেষ প্রকোপ দেখা যাইতেছে। ইহা একটী কালকৃত ব্যাধি।

গাত্রে প্রবল বেদনা, শিরোবেদনা এবং সন্তাপাধিক্য এই জ্বরের অব্যভিচারী লক্ষণ। এ রোগে গাত্র বেদনা এত অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় যে, রোগী মনে করে যেন তাহার হাড়ের ভিতর হইতে বেদনা, আসিতেছে।

এই রোগ সাধারণতঃ দুই প্রকার, যথা :—

(১) পীড়কা যুক্ত ( erruptic )

(২) পীড়কা বিহীন

ডেঙ্গুজ্বরের আয়ুর্ব্বেদীয় নাম লইয়া অনেক মত ভেদ থাকিলেও আমাদের মনে হয়, ভাবপ্রকাশোক্ত শীতলাধিকারের 'ষষ্ঠী শীতলা' ও 'পীড়কাযুক্ত ডেঙ্গু' একই ব্যাধি। এই ষষ্ঠীশীতলার লক্ষণে—ভাবমিশ্র বলেন,—

"কোঠবজ্জায়তে ষষ্ঠী লোহিতোন্নত মণ্ডলা।"

জ্বর পূর্ব্ব ব্যথা যুক্তা জ্বরস্তিষ্ঠেদ্দিনত্রয়ম্॥

অর্থাৎ বোল্তায় কামড়াইলে গায়ের চামড়ার উপর যে প্রকার স্ফীতির উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ পীড়কা সকলকে কোঠ বলে। এই ষষ্ঠী শীতলা রোগে গাত্রে রক্তাভ মণ্ডলাকার কোঠ উৎপন্ন হয়।

কোঠ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, গাত্রে গুরুতর বেদনা ও সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয়। এই জ্বর মাত্র ৩ দিন অবস্থান করে।

ডেঙ্গু জ্বরে যে পীড়কা ( Eruption ) দেখা যায়—তাহাও কোঠ সদৃশ মাত্র। সুতরাং পীড়কা যুক্ত ডেঙ্গুকে আমরা ষষ্ঠীশীতলা নামে অভিহিত করিতে পারি।

শীতলা রোগ ( মসূরিকার ন্যায় ) সংক্রামক ব্যাধি। ডেঙ্গু ও তাই। কিন্তু যেখানে পীড়কা দেখা যায় না, সেখানে 'শীতলা' বলা চলে না। কারণ পীড়কাকেই শীতলা বলা হইয়াছে। এখানে আমরা এই প্রকার মীমাংসা করিতে পারি—

"ইহ খলু নিদান দোষদূষ্য বিশেষেভ্যো বিকারাণাং বিঘাত ভাবাভাব প্রতি বিশেষা ভবন্তি। যদা হ্যেতে ত্রয়ো নিদানাদি বিশেষাঃ পরস্পরং নানুবধ্নন্ত্যথবা বা কাল প্রকর্ষাদ-বলীয়াং সোহথবানুবধ্নন্তি ন তদা বিকারাভি নির্ব্বৃত্তিঃ।" চরক

অর্থাৎ "নিদান দোষ ও দূষ্য ভেদে রোগ দিগের বিঘাত ( উৎপত্তির ব্যাঘাত ) ভাব ও অভাবের ভিন্নতা হইয়া থাকে। নিদান, দোষ ও দূষ্য —ইহারা পরস্পর অনুবন্ধী হইলে অথবা দুর্ব্বল ভাবে পরস্পরের অনুবন্ধী

হইলে রোগ উৎপন্ন হয় না অথবা রোগ হইলেও বিলম্বে হইয়া থাকে বা স্বল্পাকারে হইয়া থাকে, অথবা যথোক্ত সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন হয় না।"

এইরূপ সকল রোগের—বিঘাত ও ভাবাভাবের ভিন্নতার হেতু কথিত হইল।

ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে 'ষষ্ঠী-শীতলা' জ্বর-পূর্ব্বা। প্রকুপিত দোষ পূর্ব্বে জ্বর উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন ত্বগাশ্রয় করিয়া পীড়কা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

এখানে কেহ এইরূপ আপত্তি তুলিতে পারেন যে, "ব্যথা যুক্তা—এই কথাটী ষষ্ঠী-শীতলাখ্য পীড়কার বিশেষণ। কিন্তু ডেঙ্গু-জ্বরে পূর্ব্বেই গাত্রে ব্যথা উপলব্ধি হয়, সুতরাং ইহা ডেঙ্গুজ্বর নহে, ডেঙ্গুজ্বর স্বতন্ত্র ব্যাধি।" তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ডেঙ্গুকে 'শীতলা' আখ্যা প্রদান করিবার কয়েকটী হেতু আছে। ডেঙ্গুজ্বর হইলে অনেক সময়, ডেঙ্গুজ্বর হইবে কি হাম হইবে তাহা লক্ষণ দেখিয়া ততটা বুঝা যায় না। মুখ, চোখ এবং শরীরের অবস্থা উভয় রোগের কতকটা একই প্রকার। রোমান্ত্যার্য্যা (হাম) মসুরিকা যে প্রকার ব্যাপক ভাবে উৎপন্ন হয়, ডেঙ্গুও সেই প্রকার ব্যাপক ভাবে উৎপন্ন হয়। রোগ উৎপন্ন হইলেও অনেক স্থলে উভয়ের পার্থক্য সহজে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। ভাবমিশ্র বলেন, "দেব্যা শীতলয়া, ক্রান্তা মসূর্য্যেব হি শীতলা।" সুতরাং শীতলা ও মসুরিকা একই জাতীয় ব্যাধি। আরও এখানে 'ব্যথাযুক্তা'—গাত্র ব্যথাযুক্তা এই লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে ডেঙ্গু ও ষষ্ঠী শীতলা যে একই ব্যাধি, তাহাতে আর কোনই সংশয় থাকে না। বিশেষতঃ লোহিতোন্নত-মণ্ডলা কোঠবৎ পীড়কা' এবং 'জ্বরস্তিষ্ঠেদ্দিনত্রয়ম্' এইরূপ নির্দ্দেশের দ্বারাই উভয়ের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে। চিকিৎসাক্ষেত্রেও দেখা যায়,—রোমান্তবিধানোক্ত চিকিৎসায় ইহাতে বিশেষ ফল লাভ হয়।

এই জ্বরে সকল স্থানে যে এক প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, তাহা নহে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই।

কিন্তু গাত্র বেদনা করিয়া জ্বর আসাই ইহার অব্যভিচারী লক্ষণ।

১। গাত্র বেদনা পুরঃসর জ্বর আইসে, মাথার যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকে, জ্বরের তাপ ১০৩-১০৪° পর্য্যন্ত উঠে। প্রথম দিন প্রবল-বেগে জ্বর হয়, দ্বিতীয় দিন কমিতে থাকে এবং তৃতীয় দিন জ্বর ছাড়িয়া যায়। এরূপ অবস্থায় কোনও প্রকার ঔষধ না দিলেও চলে। তবে যদি রোগী একান্তই ঔষধ খাইতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলেই প্রথম দিন পানের রস ও মধু সহ এবং দ্বিতীয় তৃতীয় দ্বিতীয় দিন পটোলের রস মধুযোগে মকরধ্বজ দেওয়া চলে।

২। উক্ত প্রকার জ্বর সারিয়া যাইবার দুই একদিন পরে রোগীর গাত্রে পীড়োকোদ্গম, শরীরের গ্রন্থি বেদনা এবং স্থল বিশেষে পুনরায় জ্বর পরিলক্ষিত হয়। এরূপ অবস্থায় রক্তচন্দন, বাসকছাল, মুথা, গুলঞ্চ এবং দ্রাক্ষা মিলিত ২ তোলা, ইহাদের শীত-কষায় এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় একটী মহালক্ষ্মী

বিলাস—পানের রস ও মধু সহযোগে প্রয়োজ্য।

৩। সন্তাপাধিক্য জন্য—শিশুগণের অনেক সময় রসতড়কা (Convulsion) উপস্থিত হয়, সে ক্ষেত্রে মাথায় বরফ কিম্বা ঠাণ্ডা জল দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। মকরধ্বজ ½ রতি ও বজ্রক্ষার ২ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া মৌরীর জলসহ এবং বৃহদ্বাতচিন্তামণি ½ বটী মৌরীর জল সহ দিতে হইবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে পানের বোঁটায় ঘৃত মাখাইয়া অথবা "Glycerine Suppository" মলদ্বারে ঢুকাইয়া বাহে করান কর্ত্তব্য।

(৪) (ক) গাত্রবেদনা,— প্রবলজ্বর। ইহাতে রোগী অভিভূতাবস্থায় পড়িয়া থাকে। এরূপাবস্থায় মকরধ্বজ ১ রতি, মহালক্ষ্মীবিলাস ১ বটী ও মৃত্যুঞ্জয় ২ বটী একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩ বার পানের রস ও মধু সংযোগে প্রয়োজ্য। পরদিন যদি রোগীর গাত্রদাহ ও অস্থিরতা দেখা যায়, তবে "সৌভাগ্য বটী" পটোলের রস ও মধু সহ দিবসে ২ বার দিতে হয় এবং রোগীর মাথা ঠাণ্ডাজল দিয়া ধুইতে হয়।

(খ) রোগীর বমন বা বিবমিষা থাকিলে শসার রস সহ ১ মাত্রা মকরধ্বজ দিলে উপকার হয়।

(গ) রক্তবমন থাকিলে ছাগদুগ্ধের সহিত আল্‌তা গুলিয়া সেই দুধ ও চিনি সহযোগে একবটী পিত্তান্তকরস এবং পূর্ব্বোল্লিখিত রক্তচন্দনাদির শীতকষায় প্রয়োজ্য।

(ঘ) অত্যধিক পিপাসা বিদ্যমান থাকিলে ½ আধরতি মকরধ্বজও ১ আনা বজ্রক্ষার একত্র মিশ্রিত করিয়া মৌরীরজল সহ দেয়। ১ পোয়া গরমজল, সর্জ্জীক্ষার (Sodibicard) ২ আনা, লেবুর রস ½ ছটাক ও মিশ্রি ½ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে, রোগী যে পরিমাণ জল খাইতে চাহিবে তাহাকে সেই পরিমাণ এই জল দিতে হয়।

(ঙ) উদরাধ্মান থাকিলে মকরধ্বজ ½ রতি, বজ্রক্ষার ২ আনা এবং বড়এলাচ চূর্ণ ২ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া মৌরীর জলসহ প্রয়োজ্য, এই ভাগে ১ মাত্রা করিয়া দিবসে ২ বার দিতে হয়।

(চ) কোষ্টকাঠিন্য থাকিলে আরগ্বধাদি পাচন দেওয়া যাইতে পারে।

(ছ) আমাশা (প্রবাহিকা) থাকিলে মরিচ চূর্ণ ৩ রতি, কাঁটানটের শিকড় ছেঁচিয়া সেই রস ও চালুনীজলের সহিত ভুবনেশ্বর দিবসে ২ বার দিতে হইবে।

(জ) উদরাময় থাকিলে ইন্দ্রযব ভিজান জলসহ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বা মহাগন্ধক অবস্থানুযায়ী অনুপান ভেদে দিবসে ২ বার প্রয়োগ করিতে হইবে।

(ঝ) রক্তভেদ থাকিলে হ্রীবেরাদি কষায় এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বা মহাগন্ধক ইন্দ্রযব ভিজান জলসহ প্রয়োজ্য।

এই রোগে অনেক সময় রোগীর ক্ষুধা সম্যক বর্ত্তমান থাকে দেখা যায়। সেইরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে খাইতে দেখা উচিত। যদি কোন উপসর্গ না থাকে, তাহা হইলে টাট্‌কা মুড়ি দেওয়া যায়। বমন উপসর্গ থাকিলে, জলবার্লি, চিড়ার মণ্ড, ঘোল প্রভৃতি দেওয়া যায়, রক্তবমন ও রক্তাতীসার থাকিলে ছাগ-দুগ্ধ ও বার্লি প্রয়োজ্য।

সংক্ষেপে ডেঙ্গুজ্বরের সকল লক্ষণ ও তাহাদের চিকিৎসা ও পথ্য বলা হইল। রোগাবস্থায় রোগীর যত না ক্লেশ অনুভূত হয়, সারিয়া যাওয়ার পর তদপেক্ষা অধিক ক্লেশ হয়। এই সময় সাধারণতঃ দুর্ব্বলতা, অরুচি এবং গাত্র বেদনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং রোগী নানাপ্রকার অশান্তি বোধ করে। এই সময় রোগীর অরুচি শান্তির নিমিত্ত রোগীকে পল্‌তার ঝোল এবং পল্‌তার বড়া খাইতে দেওয়া উচিত। ½ বটী মহালক্ষ্মীবিলাস, ৩ রতি সৈন্ধবচূর্ণ ও আদার রস সহ প্রাতঃকালে এবং ½ রতি মকরধ্বজ ও ½ বটী গুড়ূচ্যাদিলৌহ সন্ধ্যাকালে ডালিম অথবা বেদানার রস সহ প্রয়োজ্য। এই ভাবে কয়েকদিন ঔষধ সেবন করিলে রোগীর দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ বিদূরিত হয়।

বিশেষতঃ অনেক ক্ষেত্রে এই রোগের পুনরাবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। সেইজন্য এই ব্যবস্থানুসারে কয়েকদিন ঔষধ সেবন করিলে আর পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রসঙ্গে যে সকল প্রতিষেধের উল্লেখ করা গিয়াছে, ডেঙ্গুরও সেইগুলি প্রতিষেধক।

---

# শোথ চিকিৎসা।

( মহিলাদিগের জন্য লিখিত )

বাতজ শোথ হয় যা'র,
দশমূলের ক্বাথ প্রশস্ত তা'র
কোষ্ঠবদ্ধ থাকে যদি
এরণ্ড তৈল খাও—দুধে বিধি। ১
চো না কিম্বা পুরাণমান
মণ্ড ক'রে খেতে দাও বিধান। ২
বাসকছাল, গুলঞ্চ, কণ্টকারি
চৌষট্টিকুঁচে ওজন করি
আধসের জল শেষ আধপোয়া
ব্যবস্থা কর মধু দিয়া।
জ্বর বমি শোথ, শ্বাস, কাস
সবগুলির হ'বে নাশ। ৩
শ্বেত পুনর্ণবা নিমেরছাল
পলতা, কট্‌কী, শুঁঠ—ঝাল,
গুলঞ্চ—গাঁট বাদ দিয়ে
দারু হরিদ্রা, হত্তুকি নিয়ে
এক একটি সিকিভরি
আধসের জলে ক্বাথ করি
আধপোয়া থাকতে খাওগো ঢেলে
সর্ব্বাঙ্গ শোথে সুফল মেলে।
পার্শ্বশূল শ্বাস পাণ্ডুরোগে
ব্যবস্থা দিও এই যোগে। ৪
বেলপাতার রস মরিচ চূড়
ত্রিদোষ যুক্ত শোথ করে দূর!
কোষ্টবদ্ধ, অর্শ, কামল,
এ সবে ও বড় সুফল। ৫

চিরতা, শুঁঠ বেটে জলে
খেলে শোথে সুফল ফলে
এটি খেয়ে পুনর্ণবার ক্বাথ
খেলে শোথের সব নিপাত। ৬
কুলেখাড়ার রস ঔষধ বড়
শোথে সদাই ব্যবস্থা কর।

কফজ শোথে চোনার সহ
জল দিয়া পৈত্তিকে দেহ। ৭
মানকন্দ করি পেষণ
দুধের সহ কর সেবন
প্লীহা ও শোথ সব রকমের
সেরে যাবে উক্তি শিবের। ৮

---

# পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।

( কবিরাজ শ্রীহরিচরণ গুপ্ত )

—:o:—

গ্রহণী রোগে।—

মরিচ, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব—সমানভাগে লইয়া (॥० আধতোলা) ৴॥० সের জলদিয়া ।৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঠাণ্ডাকরিয়া প্রত্যহ ২।৩ দিন দুবেলা সেবনে গ্রহণী রোগ আশু নিবারিত হয়।

মেহজ্বরেঃ—*

দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, হরীতকী, শুঁঠ, গোক্ষুর, কন্টিকারী, ধনে, মুথা, জীরা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, সোনামুখী, ছাতিমছাল, নিমের ছাল, পালিদা মাদারের ছাল, আকনাদি, প্রত্যেক ৵০ আনা পরিমাণে লইয়া ৴॥০ সের জল দিয়া জালদিয়া ।৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া ঠাণ্ডা হইলে সপ্তাহ কাল দুবেলা পান করিলে যে কোন প্রকারের মেহজ্বর নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে, এইটী বিশেষ পরীক্ষিত।

রক্তআমাশয়েঃ— (ক)

ডালিমের কচিপাতা ১ তোলা, তেঁতুলের কচিপাতা ১ তোলা, জামের কচিপাতা ১ তোলা, ডালিমের কুঁড়ি ১ তোলা, জীরা ।০ সিকিতোলা একত্রে বাটিয়া ।৵০ পোয়া জল দিয়া গুলিয়া পর পর ২।৩ দিবস খাইলে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক রক্ত আমাশা সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হয়।

পাকা বেল বা পোড়া বেলের শাঁস ৵০ পোয়া, ইসবগুল ১ তোলা, দধি ৵০ পোয়া, চিনি ‌/০ একছটাক ও গব্যঘৃত ৵০ পোয়া

---

*মেহজ্বরে এই পাঁচনটী বজরাপুর নিবাসী স্বনামখ্যাত কবিরাজ স্বর্গীয় নন্দরচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন, ঠাকুর দাদা মহাশয় প্রথমে যে সময়ে আমাকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দেন, সেইসময় আমি এই পাঁচনটীর গুণ বহুল রোগীকে দিতে দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম।—লেখক।

একত্রে মিশাইয়া ক্রমাগত ২।৩ দিন প্রত্যহ দুইবেলা দুইবার ১ তোলা পরিমাণ খাইলে রক্ত আমাশয়ে আশুফল হয়।

শিরঃপীড়ায়ঃ—

কুলের পাতার উল্টাদিকে কলিচুণ মাখাইয়া রগে বসাইয়া দিলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে শিরঃ পীড়ার শান্তি হয়।

প্রদরেঃ—

গব্যদুগ্ধ/।০ পোয়া, আম্রকেশী বাটা ১ তোলা ও একটী পাকা চাঁপাকলা একত্রে চট্‌কাইয়া প্রত্যহ ২।৩ দিবস সেবন করিলে যে কোনপ্রকারের প্রদর আশু নিবারিত হয়।

কর্ণশোথে প্রলেপঃ—

রসমাণিক /০ আনা, রসসিন্দুর /০ আনা শ্বেত অপরাজিতার ফুল ( টাট্‌কা ) ২টী ও মনসাসিজের পাতা আগুণে তাতাইয়া তাহার রস /০ একছটাক; সমস্তগুলি একত্রে বাটিয়া কর্ণশোথে প্রলেপ দিলে যেরূপ কষ্টদায়কই হউক না ২ দিনের মধ্যে উপশম হইবে।

মস্তকের উকুন মারিবার ঔষধঃ—(ক)

মস্তকের চুলে উকুন হইলে রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় পানের রস পায়ের তলায় ভালরূপ মর্দ্দন করিতে হইবে এবং চাঁপাফুলের পাতার রস চুলে মাখাইয়া শুকাইয়া ধৌত করিলে উকুন মরিয়া যায়। এইরূপে ৭ দিবস করিতে হইবে।

(খ) কাঁজির সহিত নালিতা শাকের বীজ বাটিয়া চুলে মাখাইয়া শুষ্ক করিয়া ধৌত করিলে উকুন মরিয়া যায়—এইরূপে ২।৩ দিবস করিতে হইবে।

ব্রণ শোথেঃ—

ছোট ঈশেরমূল ১ ভাগ, কেলেকড়ার মূলছাল ১ ভাগ, আদা ১ ভাগ কোকালতার পাতা ১ ভাগ, কটু হুঁকার জলে মাড়িয়া ব্রণশোথে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণাদি আশু নিবারিত হয় এবং ক্রমশঃ ঘা কমিয়া আসে। এইরূপ ৭।৮ দিবস ব্যবহার করিলে ঘা শুখাইয়া যায়।

দন্তরোগেঃ—

চাল্‌তা ফলের মজ্জা কাঁজিতে পেষণ করিয়া সচ্ছিদ্র লৌহ পাত্রে রাখিবে পরে ঐ পাত্র রৌদ্রে রাখিলে উহা হইতে যে তৈল চুঁয়াইয়া পড়িবে তাহার নস্য ও অভ্যঙ্গ করিলে ও দন্তরোগ নষ্ট হয়।

---

# বিবিধ প্রসঙ্গ ।

—•:•:•—

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—গত ২৪শে ভাদ্র সন্ধ্যা ৬॥ টার সময় কলেজ স্কোয়ার ষ্টুডেন্স্ হলে কলিকাতা "আয়ুর্ব্বেদ সভা"র একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ "বসন্ত রোগে নিম্বের প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ছিলেন।

হরনাথ সাধন সঙ্ঘ। গত ১৫ই ভাদ্র শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথের উপস্থিতিতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ভবনে "হরনাথ সাধন সঙ্ঘের ১ম সাধারণ অধিবেশন মহা সমারোহে হইয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ, ডি, লিট মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কার করিয়াছিলেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন সভাপতির উদ্দেশ্য বিবৃতি করণোদ্দেশে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। কটক মেডিকেল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, বি, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র বি, এল, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ, এম, বি প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় ৫০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন।

হরনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভবন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে সসম্মানে চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতবিদ্য ছাত্র শ্রীমান ইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত ভিষগরত্ন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, ঠাকুর শ্রীশ্রীহরনাথের আদেশ পাইয়া এবং তাঁহাকে উপস্থিত রাখিয়া গত ১৬ই ভাদ্র ৫৪ নং বড়তলা ষ্ট্রীট বড় বাজারে—"হরনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভবনে"র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গত ২৩শে ভাদ্র এই আয়ুর্ব্বেদ ভবনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৺সত্যনারায়ণের সিরণি বিতরণ ও ঠাকুর হরনাথ সম্বন্ধে সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম,এ, এম,বি,প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী এম, এ, হুগলী কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাগবত শাস্ত্রী এম, এ, অমৃতবাজার পত্রিকার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ, বড়বাজারের প্রসিদ্ধ ধনী, ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ শেঠ, মিলিটারি অফিসের অ্যাকাউটেন্ট পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ভাগবত চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ২০০ শত গণ্যমান্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

হরনাথের পত্র। ঠাকুর হরনাথের নিকট হইতে কবিরাজ শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ ঐ দিন যে উপদেশ পূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি, সে পত্র খানি এই—"স্নেহের ভাই ইন্দু, তোমার পত্র ও স্নেহের বাবার পত্র পেয়ে পরম আনন্দিত হইলাম। ভাই, তোমার

নব উত্তম, প্রভু সফল করুন। তোমার হাতে অমৃত সিঞ্চিত হ'ক। তোমার স্পর্শে যেন রোগীর রোগ-যাতনা দূর হয়। ভাই, রোগের নিবারণ করিবার ইচ্ছা সর্ব্বদা প্রাণে জাগাইয়া রাখিবে। অর্থের দিকেই কেবল দৃষ্টি করিওনা, তা'তে কবিরাজ না হ'য়ে নৃশংস কষায়ের মত হৃদয় হ'য়ে পড়ে। জীবন রক্ষার জন্য অর্থ লইবে, তবে অর্থ নিয়ে সর্ব্বদা রোগীর বিষয় চিন্তা করিবে। সকল কর্ম্মের প্রথমে প্রভুর নাম স্মরণ করিবে। প্রভু কর্ত্তা, মানুষ নিমিত্ত মাত্র মনে ক'রে সকল কাজ করিবে। সকল রকমে উন্নত হও। + + + তোমরা সকলে চির সুখে থাক, প্রভু তোমাকে কর্ম্মক্ষেত্রে হাতে ধ'রে নিয়ে চলুন।" আমরাও আমাদের পরম স্নেহ ভাজন নবীন কবিরাজ শ্রীমান ইন্দুভূষণকে ঠাকুর হরনাথের এই অমূল্য উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিবার জন্য আদেশ করিতেছি। এই উপদেশ শুধু শ্রীমান ইন্দুভূষণের প্রতি ব্যক্তিগত নহে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যেক চিকিৎসকেরই ইহা পালন করা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—

কপিলা কোটী দানাদ্ধি যৎফলং পরিকীর্তিতম্।
ফলং তৎ কোটী গুণীতমেকাতুরা চিকিৎসয়া।

অর্থাৎ কোটী কপিলা দান করিলে যে ফল লাভ হয়, একটি মাত্র আতুরকে নির্ব্যাধি করিলে তাহাপেক্ষাও কোটী গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে—আমাদের সকল ছাত্রই ইহা মনে রাখিলে আয়ুর্ব্বেদ-জগতে সত্যই যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ্ রোড্ হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।